শিক্ষা-পরিক্রমা

[প্রথম খণ্ড]

অধ্যাপক **ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য** এম. এসসি., বি. টি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগ

ভূমিকা

'শিক্ষা পরিক্রমা' শিক্ষা-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। ইহার কয়েকটি পূর্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দুইটি বিশেষ স্তর অর্থাৎ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা। কারণ এই দুই স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার সহিত দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি কম বেশি জড়িত।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য আমরা বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকেই গ্রহণ করিয়াছি। বুনিয়াদী পরিকল্পনার মূলতত্ত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের সকলেরই কিছু জানা উচিত। এই উদ্দেশ্যে পুস্তকখানিতে দুইটি প্রবন্ধ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে বৃটিশ আমলের পুরাতন আইনই বজায় রাখিয়াছি। আইনের বিষয় বস্তু, সুযোগ এবং কার্য পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে 'ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন' নামক প্রবন্ধে। আশা করি উল্লিখিত তিনটি প্রবন্ধের সাহায্যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা করা সকলের পক্ষে সম্ভব হইবে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য 'মুদালিয়র কমিশন রিপোর্ট' এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ঐ উদ্দেশ্যে 'দে কমিশন রিপোর্ট' দুইটি উল্লেখযোগ্য দলিল। উক্ত দুইটি রিপোর্টের মূল সুপারিশগুলির ভিত্তিতে যে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা চলিতেছে তাহা প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

ঐ সংস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য 'মধ্যশিক্ষার নব রূপায়ণ ও বহুমুখী বিদ্যালয়' নামে অন্য একটি প্রবন্ধ দেওয়া হইয়াছে। আশা করি উহার সাহায্যে 'শিক্ষাতত্ত্বের' দিক হইতে বহুমুখী বিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু বিবরণ পাওয়া যাইবে।

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার উন্নতির জন্য জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইয়া এখন দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল চলিতেছে। একটি প্রবন্ধে উক্ত দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি শিক্ষার জন্য যে কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা আমরা কমবেশি প্রভাবান্বিত। 'পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ বিল' লইয়া যখন কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে আলোচনা হয়, তখন সরকারী এবং বিরুদ্ধ পক্ষ উভয়েই স্ব স্ব যুক্তির সমর্থনে ইংলণ্ডের ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করেন। আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা বুঝিবার জন্য একটি প্রবন্ধের মারফৎ ১৯৪৪ সালের ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনটির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করা হইয়াছে।

পুস্তকখানির প্রারম্ভে আমরা 'ভারতীয় শিক্ষার ধারা' নামক যে প্রবন্ধটি আলোচনা করিয়াছি উহা সাধারণভাবে সমস্ত পুস্তকখানির ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্য একটি প্রবন্ধে (একটি ঐতিহাসিক শিক্ষা পরিকল্পনা) কংগ্রেস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টের (১৯৩৯) প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে শিক্ষার

উন্নয়নের জন্য আমরা কিরূপ পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম সেই সম্পর্কে কিছু আভাস প্রবন্ধটিতে পাওয়া যাইবে।

বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে দেশের বর্তমান শিক্ষানীতিকে মাঝে মাঝে কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে; আশা করি উক্ত সমালোচনাকে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে পাঠকেরা বিচার করিবেন।

এই পুস্তকের বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্বের সুযোগ্য অধ্যাপক সুবোধ চন্দ্র দত্ত এম, এ, (লণ্ডন) ডিপ্, এড্ (লণ্ডন) মহাশয় নানাবিধ অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া লেখককে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পুস্তকখানিতে বি, এ ও বি, টি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 'শিক্ষা বিষয়ক ইতিহাস' ও 'রচনা' পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আশা করি তাহারা এই পুস্তকখানি হইতে কিছু উপকার পাইবেন।

আমার ছাত্র ও সুশিশু-সাহিত্যিক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং নিধুসূদন চৌধুরী নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পুস্তকখানি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে কয়েকটি মুদ্রণত্রুটি রহিয়া গেল। এই জন্য আমরা দুঃখিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষণ-শিক্ষা বিভাগ
১৬১, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড
কলিকাতা—২৬

ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য
শ্রীপঞ্চমী,
১৩৬৪ সাল

সূচীপত্র

ভারতীয় শিক্ষার ধারা

সাইমন কমিশনের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রচার-নেতা লর্ড লোথিয়ান ভারতের গ্রামাঞ্চলের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতে ফরিদপুরের এক গ্রামে গিয়াছিলেন। লোথিয়ান সাহেব গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমাদের কি চাই'? গ্রামের চাষীরা বলিল,—'শিক্ষা'। লোথিয়ান সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন। খাজনা মকুব চাহিল না, সুদ মাপ চাহিল না, চাষের বলদ, জমির জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা এমন কি পাটের দর, কোঅপারেটিভ ক্রেডিট্—এসব কিছুই নয়, চাই না কি শিক্ষা! লর্ড লোথিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেন'? গ্রামের লোকের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত সন্দেহ নাই। তবুও তাহারা যে উত্তর দেয় তাহা এই;—একজন বলিল,—'নইলে আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ'। আর একজন বলিল,—'জমিজমার দাখিলা হিসাব পত্র কিছু যে আমরা নইলে পড়িতে পারি না।" অর্থাৎ লেখাপড়া না জানার অভাব গ্রামবাসীরা বোঝে তাহাদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে।

এই ঘটনার একযুগ পরে ক্রিপস্ মিশনের সময়ে ইংরাজ মন্ত্রীরা গিয়াছিলেন দিল্লীর কাছে গুরগাঁও জেলায় গ্রামের মানুষের কথা শুনিতে। সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে গুরগাঁওয়ের গ্রামের কৃষকেরা নাকি বৃটিশ মন্ত্রীদের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল,—"চাই শিক্ষা, আর সেচের জল।"

যে শিক্ষাহীনতা আজ ভারতবর্ষে প্রায় দুইশত বৎসরের বিদেশী শাসনের ফলে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ বহুদিন হইতে সংগ্রাম চালাইতেছে। গ্রামের কৃষকের নিকট, কারখানার মজুরের নিকট, অন্যান্য সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট দৈনন্দিন

অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এই শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। তাহারা ইহা উপলব্ধি করিয়াছে যে লেখাপড়া না জানার জন্য জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পদে পদে তাহাদের ঠকিতে হইতেছে। তাই মানুষের নিকট খাদ্যবস্ত্রের মত শিক্ষার দাবী চিরন্তন দাবী।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হইয়াছে। ভারতীয় জীবনের প্রতিটি দিক আজ দ্রুততর পরিবর্তনের সম্মুখীন। শিক্ষা ব্যবস্থায়ও যে আজ ব্যাপক পরিবর্তন আসিতেছে ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কিরূপ পরিবর্তন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া ভারতের বৃটিশ-প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারা আজ গণতান্ত্রিক শিক্ষায় রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে—ভারতীয় ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনাকে উপযুক্ত ভাবে বুঝিবার জন্য, উহা আজ আমাদের বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা গত দুইশত বৎসরের বৃটিশ শাসনের ফলে সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গ করিয়া বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক মেকলে সাহেব বলিয়াছিলেন—'আমরা ইংরাজী ভাষাকেই এতদ্দেশীয় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছি'। কারণ মেকলে সাহেবের মতে 'ভারতের ও আরবদেশে সমগ্র সাহিত্য ও দর্শন ইউরোপীয় সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র অংশেরও সমকক্ষ নহে।' মেকলের মিনিট হইতে এমন বহু উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যাহা দেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনীতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খুব আপত্তিকর মনে হইতে পারে। মেকলে এরূপভাবে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছিলেন যে জ্ঞান বিজ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের কিছুই নিজস্ব নাই এবং আধুনিক শিক্ষার অভাব মিটাইবার জন্য ভারতকে ইংলণ্ডের নিকট ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত হওয়া ছাড়া আর অন্য

কোন উপায়ও নাই। কিন্তু ইহা যে ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা তাহা আজ আর কাহারও নিকট অস্পষ্ট নাই।

অন্য কোন প্রমাণের উল্লেখ না করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে উনবিংশ শতাব্দীতেও শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তাহার পূর্ববর্তী মান সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইতেছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহু কর্মচারী ভারতীয় সাহিত্য-দর্শনের মধ্যে উচ্চ চিন্তাধারার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন এবং তাহাদের অনেকেই ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের চর্চায় অবসর অতিবাহিত করিতে ভালবাসিতেন। স্যার উইলিয়ম জোন্‌স, উইলসন্‌, প্রিন্‌সেপ প্রভৃতি সাহেবের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের উন্নততর অবস্থার কথা আমরা জানিতে পারি উইলিয়ম আডম্‌ সাহেবের রিপোর্টে। উইলিয়ম আডম ১৮১৮ সালে ভারতবর্ষে আসেন মিশনারী হিসাবে। ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক আডমকে বঙ্গদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অনুসন্ধান কল্পে নিযুক্ত করেন। ১৮৩৫ সাল হইতে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত আডম সাহেব বঙ্গদেশের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া তিনটি রিপোর্ট দাখিল করেন। মিঃ আডমের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় তৎকালীন বঙ্গদেশে শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রায় লক্ষাধিক বিদ্যালয় বর্তমান ছিল। আডম সাহেব দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের উন্নতির নানা সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কারণে কোম্পানি উক্ত সুপারিশসমূহ কার্যে পরিণত করিতে রাজি হইলেন না। মেকলের মিনিট অনুযায়ী ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের অনুকূলে মত প্রদান করিলেন।

তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যবশত কোম্পানি ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের

অনুকূলে রায় প্রদান করেন। কারণ গভর্ণমেণ্ট ও কোম্পানির বিভিন্ন অল্প মাহিনার কাজে ইংলণ্ড হইতে লোক আনা সম্ভব ছিল না। সেই জন্য এই দেশে এমন এক শ্রেণী সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল যাহারা ব্যক্তিগত সুবিধার লোভে ভারতবর্ষকে শোষনের জন্য বৃটিশ জাতিকে নানাভাবে সাহায্য করিবে। মেকলের ঘোষণার পর ঐ সমস্যার কিছু সমাধান হইল। ইংরাজী জানা ব্যক্তিদের সুযোগ সুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করিলেন যে ভবিষ্যতে সকল প্রকার সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই কর্মচারী নিযুক্ত করা হইবে।

এই নূতন সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে যে দেশের শ্রেণীবিশেষের বিশেষ উন্নতি হইল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর 'নব্যবাবু' দলের সৃষ্টি হইল,—যাহারা এই দেশীয় হইয়াও, চিন্তায় ও বাক্যে পুরাপুরি সাহেবি ধারায় অভ্যস্থ হইলেন।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় যে অন্তর্নিহিত সংঘাত থাকে, তাহা সহজে অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন সংবাদ ও আলোচনা এদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং এক শক্তিশালী জাতীয়তাবোধ ভারতীয় জনসাধারণকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিল। ভারতবর্ষের বিদেশী শাসক শ্রেণী নিশ্চয়ই এই অবস্থার কথা গভীরভাবে চিন্তা করেন নাই; কারণ পরববর্তী দিনে শাসকশ্রেণী ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনকে 'a grave political miscalculation' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গতিরোধ করিবার জন্য শাসকশ্রেণী নানাভাবে চেষ্টা করিলেও সকলেই জানেন তাহা নানা কারণে সম্ভব হয় নাই।

ভারতীয়-শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় আনয়ন করিবার

জন্য কর্তৃপক্ষ ১৮৫৪ সালে শিক্ষাবিষয়ক নীতি প্রচার করিলেন। উহা '১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচ' নামে খ্যাত। উক্ত ডেসপ্যাচে ইংরাজী শিক্ষাব উন্নতিকল্পে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রদান করা হইল। সকলেই জানেন যে উক্ত নীতি অনুসারে প্রেসিডেন্সী সহরসমূহে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয়সমূহে সাহায্য প্রদানের নীতি প্রণয়ন। এবং শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপনের জন্য গভর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হন।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে উক্ত শিক্ষাবিষয়ক নীতি পুরাপুরি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় না। অত্যন্ত হিংস্রতার সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ উক্ত বিদ্রোহ দমন করিল বটে, কিন্তু শাসন পরিচালনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আরও সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, এবং ১৮৫৯ সালে লর্ড ষ্টানলে ১৮৫৪ সালের শিক্ষাবিষয়ক ডেসপ্যাচ সংশোধন করিয়া নূতন ডেসপ্যাচ প্রণয়ন করিলেন।

১৮৫৪ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসারের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় এই যুগে শিক্ষা প্রসারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে এক নূতন জাতীয় বোধের উন্মেষ হয়। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতে জাতীয়তাবোধ উন্মেষে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের দান এখনও আমাদের ঐতিহাসিকগণ তেমন ভাবে আলোচনা করেন নাই।

অল্প মাহিনার চাকুরীতে নিযুক্ত করিবার জন্য কেরানীকুল সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল—তাহার প্রয়োজনও অত্যন্ত দ্রুত

নিঃশেষ হইয়া গেল। কারণ সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীতে যত শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন তাহার চেয়ে বেশি শিক্ষিত বেকার যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইয়া প্রতি বৎসর বাহির হইতে লাগিল। অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিল দেশের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় তাহার সমাধানে রাজনীতির দিকে দৃষ্টি দিল। সমস্যার ব্যাপক আলোচনার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৮৮২ সালে নূতন এক শিক্ষা-কমিশন বসাইলেন। ইহা 'হাণ্টার কমিশন' নামে বিখ্যাত। কমিশন সমস্যার নানাদিক দিয়া আলোচনা করিয়া বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সুপারিশ করিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য নানাবিধ মন্তব্য করিলেন এবং শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের উপযোগী করিবার জন্য কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তনের সপক্ষেও মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট আপন দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত সংস্কার সাধনে অনিচ্ছুক, সেই গভর্ণমেণ্ট যে তাহার অধীন দেশে কোনরূপ সংস্কার আনিতে ইচ্ছা করিবে না ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র। হাণ্টার কমিশনের রিপোর্ট ও পুরাতন সরকারী দলিলের অন্তরালে চাপা পড়িয়া গেল।

কিন্তু ১৮৮২ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। লর্ড কার্জন ইহাতে প্রমাদ গণিলেন এবং উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য নূতন ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নূতন আপদ আমদানী করা হইল—'গুণ ও সংখ্যার' বিচার অর্থাৎ 'quality or quantity' সুতরাং ষড়যন্ত্রের স্লোগান হইল—গুণের জন্য সংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ কর। ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসান হইল এবং ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি নিয়ন্ত্রণের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট দেওয়া হইল।

১৮৬১-৬২ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন

সভায় প্রথমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের স্থান দিতে বাধ্য হইল এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার প্রদান করিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এইভাবে শক্তি অর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানাভাবে চাপ দিতে লাগিল। ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন এইরূপ আন্দোলনের ফল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—এই ধরণের কমিশনের উদ্দেশ্য হইল জাতীয় বিক্ষোভকে কিছু সময়ের জন্য অন্য দিকে চালিত করিবার চেষ্টা করা। কারণ কার্যক্ষেত্রে নানা ওজুহাতে কমিশনের কোনও সুপারিশই কার্যে পরিণত করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হয় না।

কিন্তু শিক্ষা বিস্তার ও সামান্য কিছু রাজনৈতিক অধিকার লাভের পর আরও সুবিধা লাভের জন্য জাতীয় আন্দোলন বাড়িয়াই চলিল। এবং এই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনও আরম্ভ হইল। ১৯১০-১২ সালে বিখ্যাত জাতীয় নেতা গোখেল সমগ্র দেশে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবীতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় এক বিল আনয়ন করিলেন। কিন্তু সরকারী মনোনীত সভ্যদের ভোটে বিলটি বাতিল হইয়া গেল। এই সময়ে গোখলে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। কারণ উহাতে ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হইয়াছিল। আমরা বড়লাটের কাউন্সিলে গোখেলের বক্তৃতার একটি অংশ মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

"মাননীয় মহাশয়, আমি জানি যে অদ্যই আমার বিলটি বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহার জন্য আমি বিন্দুমাত্র হতাশ হই নাই। ইংলণ্ডেও ১৮৭০ সলের প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশের ইতিহাস আমি জ্ঞাত আছি। সেখানেও এইরূপ প্রাথমিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছিল। অধিকন্তু আমি মনে করি যে বর্তমান সময়ে আমরা

বিফলতার মধ্য দিয়াই দেশকে সেবা করিবার আশা করিতে পারি। যে সমস্ত দেশবাসী সফলতার মধ্য দিয়া দেশকে সেবা করিবে—তাহারা পরে জন্মগ্রহণ করিবে। আমরা আমাদের যথাযোগ্য কর্ত্তব্য করিতেছি এই মনে করিয়া সন্তুষ্ট আছি। অদ্যকার সভায় পরিত্যক্ত বিলটি পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত হইবে, যতদিন না পর্যন্ত এই বিলের চিতাভস্মের উপর এমন ব্যবস্থা সৃষ্টি হইবে যাহার সাহায্যে দেশের সর্বত্র জ্ঞানের আলোক বিতরিত হইবে।......অদ্য আমরা মনে করি যে আমরা আমাদের কর্তব্য করিয়াছি এবং যখন কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় সেই সময় ইহাই মনে হয় যে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়া ব্যর্থতা বরণ করা ভাল, কিন্তু নীরবে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকা কোনক্রমেই উচিত নহে।"

১৯১৪ সালের যুদ্ধের পর ভারতে জাতীয় আন্দোলন ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিল। ১৯১৯ সালে ভারতীয়দের হস্তে কিছু শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইল। সুতরাং শিক্ষাব্যাপারে কিছু সংস্কার করাও সম্ভব হইল। বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করিলেন। কিন্তু আইনের ত্রুটি, অর্থাভাব ও গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নিষ্ক্রিয়তা ও উৎসাহের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি করা সম্ভব হইল না।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে আপনাকে বৃটিশ শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিল। কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে শাসন-ক্ষমতা দখল করিল। রাজনৈতিক অধিকার লাভের পর ইহাই আশা করা স্বাভাবিক যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রথমেই শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে আপনার ক্ষমতা ও সঙ্গতির উপযুক্ত ব্যবহার করিবেন। কারণ ১৯৩৮ সালে হরিপুরাতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে কংগ্রেস

কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন—"গত ১৯০৬ সাল হইতেই কংগ্রেস জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা জোরের সহিত স্বীকার করিয়া আসিতেছে। গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে কংগ্রেসের সাহায্যে বহু জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়। ইহা নিঃসন্দেহ যে বর্তমান শিক্ষা নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার লক্ষ্য বর্তমান যুগের উপযোগী নহে এবং এই ব্যবস্থায় সামান্য সংখ্যক ব্যক্তিই মাত্র লাভবান হইতেছে; অধিকাংশ দেশবাসী এই ব্যস্থায় কোনরূপ বিদ্যালাভের সুযোগ পাইতেছেন না। সুতরাং নূতন ভিত্তির উপর সার্বজনীয় জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠন অবিলম্বে প্রয়োজন।" (হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব হইতে।)

আমাদের শাসনতন্ত্রে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার কারণ যাহাই হউক না কেন শিক্ষার অধিকার যে সভ্য দেশে নাগরিক মাত্রেরই জন্মগত দাবী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল আমরা আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার প্রায় দশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছি। এই দশ বৎসরে আমরা শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে যে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি তাহাদের গুণাগুন আলোচনা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক নহে। শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন তাহা নিম্নরূপ। (১) দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমানরূপ আলোচনা করা এবং ঐ সম্পর্কে উন্নতির জন্য নানাবিধ সুপারিশ করা। (২) শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনাকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনার অংশ হিসাবে উপলব্ধি করা এবং ঐ অনুসারে পরিবর্তনের চেষ্টা করা। (৩) ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এইরূপ নূতন ভাবে গঠন করা যাহাতে ভবিষ্যতে

ভারতবর্ষের প্রত্যেক শিশু প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগ, সমান অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণন কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মুদালিয়ার কমিশন দেশের উচ্চশিক্ষা ও মধ্যশিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা আজ ভারতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ভারতবর্ষের ৯ কোটি ছেলেমেয়েদের জন্য আগে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই সমস্যা আলাদাভাবে সমাধান করা সম্ভব নহে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে একযোগে এই জাতীয় সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য একমাত্র বুনিয়াদী শিক্ষাকেই গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পদ্ধতির গুণাগুণ লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে (অন্যত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু একটি প্রধান গুণের জন্য এই পদ্ধতি দেশের শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই পদ্ধতিতে দেশের সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাভাবে এখনও সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হইতেছে না।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থাভাব একটি প্রধান কারণ হইলেও উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবও এই সম্পর্কে একটি প্রধান ত্রুটি। বাংলা দেশে বর্তমানে যে দুইটি প্রাথমিক শিক্ষা আইন দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে—তাহা বিবিধ কারণে আজ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। (এই আইনের প্রধান বিষয়গুলি আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।) বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই সম্পর্কে আজও কোন উপযুক্ত সংস্কার সাধন করা সম্ভব হয় নাই। উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই যে ইহার মূল কারণ—ইহা অনেকে মনে করেন।

ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলির অবস্থা পর্যালোচনা করিলে ইহাই মনে হইতে পারে যে প্রাথমিক শিক্ষার মত এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পিছনে কোন সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা নাই। সরকারী ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আমরা 'বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি'কে গ্রহণ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অরাজক অবস্থা বিরাজ করিতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। সরকারী আনুকূল্যে কিছু বিদ্যালয় বুনিয়াদী পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হইলেও এখনও অধিকাংশ বিদ্যালয় পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী চলিতেছে। এই পুরাতন বিদ্যালয়গুলির অনেকগুলি আবার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অংশবিশেষ। এইগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র জোগান দেওয়া। কতকগুলি বিদ্যালয় আছে য়ুরোপীর মিশনারীগণ কর্তৃক পরিচালিত। বৃটিশ আমলের ভাবধারা পুরাপুরি বজায় রাখিয়া এইগুলি পরিচালিত হইতেছে। বর্তমান পরিবর্তিত জাতীয় অবস্থায় এই সমস্ত বিদ্যালয়ের যে বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই—এইরূপ অনেকে মনে করেন। কিছু বিদ্যালয় আছে যেগুলিতে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক এই উভয় শ্রেণীর ব্যবস্থা বর্তমান। এই বিদ্যালয়গুলির অনেকগুলি ফ্রোয়েবলের কিণ্ডারগার্টেন ও মন্তেসরী পদ্ধতি অবলম্বনে পরিচালিত হয়। সকলেই জানেন এই পদ্ধতির সহিত বুনিয়াদী পদ্ধতির মূলগত পার্থক্য আছে।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই অরাজকতা নানা কারণে আলোচনার যোগ্য। গণতন্ত্রের মূলসূত্র এই যে জাতিধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিবে। কিন্তু একই দেশে যদি শিক্ষার্থীর আর্থিক সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন ধারা প্রচলিত থাকে তবে প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা বাধাস্বরূপ বলিয়া মনে হয় এবং

ভারতীয় ঐক্য ও জাতীয়তার জন্যও এই নীতি বিশেষভাবে পরিবর্তনযোগ্য।

প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিলে মনে হয় এই বিষয়ে দেশে বিভিন্ন ধারা প্রচলিত এবং এইরূপ বিচিত্র ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী। বৃটিশ শাসনে দেশের নানা শ্রেণীর প্রয়োজন অনুসারে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহা দেশের বিভিন্ন স্বার্থ অনুযায়ী পুরাতন অবস্থা বজায় রাখিয়া চলিতে চাহিতেছে।

মধ্য শিক্ষা-ব্যবস্থাও আমাদের দেশে এখনও কোন নিজস্ব জাতীয় রূপ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। এ ক্ষেত্রেও বিচিত্র ধারা প্রবাহিত রহিয়াছে। মিশনারীদের পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি ছাড়াও, পুরাতন মধ্য-বিদ্যালয়, নবপরিকল্পিত একাদশশ্রেণী বিশিষ্টউচ্চতর মধ্য-বিদ্যালয় ও এই শ্রেণীর বহুমুখী বিদ্যালয়গুলি মধ্য-শিক্ষার বিচিত্র ধারা বহন করিয়া চলিতেছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আবার সরকারী ও বেসরকারী এই শ্রেণীতে বিভক্ত। সরকারী বিদ্যালয়গুলির মর্যাদা ও সুযোগ বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি হইতে আলাদা। প্রাথমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে অরাজকতা ব্যাপকভাবে বিরাজমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহেও তাহার প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ছাড়া আর এক শ্রেণীর বিদ্যালয় আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রধান হইয়া বিরাজ করিতেছে। উহা বৃটিশ আমলে সামন্ত রাজাদের পুত্রকন্যাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত 'পাবলিক স্কুলসমূহ'। অর্থাৎ ভারতবর্ষে যেমন বিভিন্ন শ্রেণী নব নব বৈচিত্রে বিরাজমান, তেমনি শিক্ষাক্ষেত্রেও এই সব শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী নানা ব্যবস্থা প্রচলিত।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া গবেষণার ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ

সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলেও, উচ্চশিক্ষার ধারা প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়াই প্রবাহিত হইতেছে।

প্রায় দশ বৎসর হইল ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনের নাগপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছে। দুইশত বৎসরের অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করিবার জন্য এই দশ বৎসর সময় খুব বেশি নয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই শিক্ষা-সংস্কারের ব্যাপারে যেরূপ উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন বর্তমান কর্তৃপক্ষের তাহা অভাব আছে বলিয়া মনে হয়। উচ্চশিক্ষা ও মধ্য-শিক্ষার সংস্কারের কথা না তুলিয়াও এই কথা বলা যায় যে গান্ধীজী যে আশা মনে রাখিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা আমরা ঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। গ্রামের চাষীরা ক্রিপস্ মিশনের নিকট যে দাবী তুলিয়াছিল—অর্থাৎ 'চাই শিক্ষা ও সেচের জল'—এই দাবীর ন্যায্যতা আমরা তেমন বুঝিতে পারি নাই। দশ বৎসর একটি ব্যাপক জাতীয় সংস্কারের পক্ষে খুব বেশি সময় নয় এই কথা ঠিক; কিন্তু ইহাও সকলে নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা যদি শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারিতাম তবে এই সময়ের মধ্যেই আমাদের পক্ষে আরও বেশি কাজ করা সম্ভব হইত।

ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়া দেখিলে মনে হয় শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে দেশে দুইটি পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘাত আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। ইহাই বোধ হয় ইতিহাসের ধারা। বৃটিশ শাসনকালে এই সংঘাত ঘটিয়াছিল বিদেশী স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে এবং বর্তমান জাতীয় শাসনকালে ইহা ঘটিতেছে শ্রেণী-স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক জাতীয় দাবী পুরাপুরি না মানিতে পারিলে এই সংঘাত অতিক্রম করা সম্ভব হইবে না। দেশের শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদদের এই সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা

পরিকল্পনার ইতিহাস, বুনিয়াদী শিক্ষার মূলতত্ত্ব পাঠ্যক্রম, মূলশিল্প নির্বাচন, মাতৃভাষা শিক্ষার মান, গণিত, সামাজিক শিক্ষা, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কন বিদ্যা, হিন্দুস্থানী ভাষা, বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি, পরীক্ষা সংস্কার, পরিচালনা ও সংগঠন, কার্যকাল, একাধিক শিল্প শিক্ষা, বিদ্যালয়ে জলযোগ, শ্রেণীগঠন, শিক্ষক নির্বাচন ও যোগ্যতা, গবেষণা।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা তাহার অভিনবত্বের জন্য ইতিমধ্যেই জগতের শিক্ষাবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহাকে নানা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা, নঈতালিম (New Education), বুনিয়াদী পরিকল্পনা বা বেসিক পদ্ধতি বলিতে গান্ধীজীর পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতিকেই বুঝায়।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা যে ইতিমধ্যেই একটি নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা হিসাবে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার প্রধানতঃ দুইটি কারণ আছে। প্রথমত এই পরিকল্পনা গান্ধীজীর ন্যায় একজন মহামানবের জীবন দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত এবং মূলতঃ তিনিই এই পরিকল্পনার স্রষ্টা; দ্বিতীয়ত, ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষানীতিকেই একমাত্র শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং যে শিক্ষানীতি ভবিষ্যৎ ভারতের লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার মূল নীতি, পদ্ধতি, ও লক্ষ্য সম্পর্কে সকলেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পরিকল্পনার ইতিহাস

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ার্দ্ধায় মারোয়াড়ী শিক্ষাসংঘের (Marwari Education Society) রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সোসাইটীর কর্তৃপক্ষ স্থির করেন যে এই উপলক্ষ্যে ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে দেশের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের এক সম্মেলন অনুষ্ঠান করা হইবে এবং ঐ সম্মেলনে গান্ধীজী ১৯৩৭ সালের 'হরিজন' পত্রিকায় 'স্বাবলম্বী শিক্ষা পরিকল্পনা' (Self-supporting Education) সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলেন,—উহার মূলনীতির ভিত্তিতে এক আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করা হইবে। কংগ্রেসের বর্তমান সম্পাদক শ্রীমন্ নারায়ণ ঐ সময়ে ঐ মারোয়াড়ী সোসাইটীর সম্পাদক

ছিলেন এবং বিখ্যাত শিক্ষাবিদ আর্যনায়কম্ ঐ সোসাইটী পরিচালিত নবভারত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। গান্ধীজী ঐ সভার সভাপতি হিসাবে একটি সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন। উহাতে তিনি তাঁহার শিক্ষানীতির মূল তত্বগুলি ব্যাখ্যা করেন। এই আলোচনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মি যোগদান করেন। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া ইস্‌লামিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ জাকীর হোসেন, আচার্য বিনোবাভাবে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কাকাসাহেব কালেলকার, অধ্যাপক কে, টি, শা' প্রভৃতি ব্যক্তিগণ গান্ধী-শিক্ষা-পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা করেন। আলোচনার পর নিম্নলিখিত চারিটী প্রস্তাব সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত হয়।

(১) দেশেব সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য (অর্থাৎ সাত বৎসরের জন্য) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) শিশুর মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দিতে হইবে।

(৩) গান্ধীজীর পবিকল্পনা ছিল যে শিশুর পরিবেশের সহিত সঙ্গতি বাখিয়া একটি সৃজনমূলক (productive) শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্ববিধ শক্তি ও গুণ বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রদান কবিতে হইবে। সম্মেলনে গান্ধীজীর এই পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়।

(৪) এই শিক্ষা স্বাবলম্বী (self-supporting) হইবে; অর্থাৎ এই শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার মারফৎ ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইবে—তাহা বিক্রয় করিয়া শিক্ষকদের পারিশ্রমিক প্রদান করিতে হইবে।

অতঃপর নূতন শিক্ষা পরিকল্পনার পাঠ্যক্রম ও অন্যান্য বিষয় স্থির করিবার জন্য ডাঃ জাকীর হোসেনকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটী গঠিত হয়। ঐ কমিটী [illegible] তাহাদের রিপোর্ট প্রদান

করিবেন—ইহা স্থির হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে ১৯৩৭ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে জাকীর হোসেন কমিটী তাহাদের রিপোর্ট প্রদান করেন। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতেই বুনিয়াদী পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করে।

বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনার মূল তত্ত্ব

নিম্নলিখিত কয়েকটি মূলনীতিকে ভিত্তি করিয়া বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হয়।

(১) সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত সর্ব শ্রেণীর বালক-বালিকাদের জন্য বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) শিশুর মাতৃভাষা হইবে ঐ শিক্ষাব মাধ্যম।

(৩) একটি সৃজনমূলক (productive) শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে।

(৪) শিক্ষার্থীর সামাজিক পরিবেশেব সহিত সম্পর্কযুক্ত একটি অর্থকরী শিল্পকেই মূল শিল্প হিসাবে নির্বাচন কবিতে হইবে।

(৫) এই শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষাব মান হইবে বর্তমান প্রবেশিকা শ্রেণীর শিক্ষার মানের সমান; তবে ইহা হইতে ইংরাজীর জ্ঞান বাদ দিতে হইবে।

(৬) এই পরিকল্পনায় শিল্প শিক্ষায় এইরূপ গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে যে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৭) অহিংসা, সহযোগিতা এবং সামাজিকতা—এই গুণগুলিকে এই শিক্ষা পরিকল্পনার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

উপরে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার মূল নীতি প্রদত্ত হইল। উক্ত নীতিগুলি সম্পর্কে জাকীর হোসেন কমিটীর আলোচনা নানা কারণে

উল্লেখযোগ্য। কমিটী তাহার রিপোর্টে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিগুলি আলোচনা করেন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যে আমাদের জীবনের আশা ও প্রয়োজনের অনুরূপ নহে—ইহা নিঃসন্দেহ। শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ শিক্ষার্থীকে মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা,—দেশের ও সমাজ জীবনের উপযুক্ত করা। শিক্ষার এই যে মহৎ সৃষ্টির দিক, জীবনের দিক,—ইহা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় খুবই গৌণ।

সুতরাং বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য নব পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা নিশ্চয়ই প্রচলিত পদ্ধতি হইতে ভিন্নরূপ হইবে। কারণ আমাদের বর্তমান পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করিয়াছি পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী। ভারতবর্ষ সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধানের জন্য অহিংসাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। এই সম্পর্কে মহাত্মাজীর নেতৃত্বই আমাদের প্রধান ভরসাস্থল। বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি তাহারই পরিকল্পনা। তিনি বিভিন্ন সময়ে 'হরিজন' পত্রিকায় শিক্ষাবিষয়ক যে প্রবন্ধগুলি রচনা কবিয়াছিলেন—বর্তমান পরিকল্পনার ভিত্তি হইতেছে তাহাই।

বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা সম্পর্কে কমিটীর মত এই যে এই নীতি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান-সম্মত। জ্ঞানেব ঐক্য ও সম্পর্ক নির্ণয়েও শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা বিশেষ উপযোগী।

মনস্তত্ত্বের দিক হইতেও এই শিক্ষা পবিকল্পনার বিশেষ উপযোগিতা আছে। কারণ এই পরিকল্পনার সাহায্যেই শিক্ষার্থী জ্ঞানের সহিত কর্মের সম্পর্ক নির্ণয়ে সক্ষম হইবে। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর শরীর ও মন উভয়েরই বিকাশ হইবে অর্থাৎ সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিবে।

সামাজিক দিক হইতেও বিবেচনা করিলে এই শিক্ষা-পরিকল্পনা সর্ব বিষয়ে গ্রহণযোগ্য। কারণ একটি অর্থকরী শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা

গ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীর নিকট কায়িক শ্রমের মর্যাদা বিশেষভাবে অনুভূত হইবে ; এবং বর্তমানে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার ফলে আমাদের দেশে মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করা সম্ভব হইবে।

শিক্ষাব **অর্থনৈতিক দিক** হইতেও আলোচনা করিলে এই পরিকল্পনার উপযোগিতা প্রমাণিত হইবে। এই শিক্ষা পবিকল্পনা শ্রমিকদেব কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিবে এবং অবসর বিনোদনেব জন্য তাহাবা এখন একটি কর্মেব সাহায্য পাইবে যাহার সাহায্যে তাহাদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হইবে।

কেবলমাত্র **শিক্ষাতত্ত্বের** দিক হইতে আলোচনা করিলেও এই পরিকল্পনার উপযোগিতা বিশেষভাবে অনুভূত হইবে। যে জ্ঞান শিক্ষার্থীব আপন অভিজ্ঞতার অংশস্বরূপ—সেই জ্ঞানই শিক্ষার্থীর নিজস্ব জ্ঞান। অধিকন্তু শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষাব সাহায্যে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষাব অনুবন্ধ নীতিব (correlation) অনুসারী।

মূল শিল্প নির্বাচন সম্পর্কে কমিটীব মত এই যে শিল্পটি যেন শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা প্রদানেব উপযুক্ত ও সম্ভাবনা যুক্ত হয়। এই শিল্প শিক্ষা প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমভুক্ত সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা যেন সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সহিত শিল্প শিক্ষার একটি স্বাভাবিক সম্পর্কও যেন এই প্রসঙ্গে ধবা পড়ে। এই শিল্প-শিক্ষার উদ্দেশ্য দক্ষ শিল্পী সৃষ্টি করা নয় এবং যান্ত্রিকভাবেও এই শিল্প শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। এই শিল্প-শিক্ষা প্রসঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা কর্মপরিকল্পনার ক্ষমতা, উৎসাহ সৃষ্টি এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

আমাদের সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়সমূহের উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপনের

জন্যও এই শিক্ষা-পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হইবে। উপযুক্ত নাগরিকত্ব-বোধ অর্জনের জন্য যে শিক্ষা তাহা আজ নূতন রাষ্ট্রনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আত্মনির্ভরতা, দায়িত্ববোধ, স্বাধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের জন্যও এই শিক্ষা পরিকল্পনা বিশেষ কার্যকরী বলিয়া মনে হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার স্বাবলম্বীনীতি (self-supporting scheme) সম্পর্কে কমিটীর মন্তব্য এই যে এই সম্পর্কে শিক্ষাবিদ মহলে নানাবিধ সন্দেহের সৃষ্টি হইতে পারে। বুনিয়াদী পরিকল্পনার স্বাবলম্বীনীতি সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত নহে। তবে এই সম্পর্কে তাহাদের মত এই যে এই নীতি যতদূর সম্ভব কার্যকরী করার চেষ্টা করা যাইতে পারে। স্বাবলম্বী নীতির অন্যতম প্রধান দিক এই যে ইহার সাহায্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রদানের দক্ষতার পরিমাপ করা যাইতে পারিবে। তবে এই বিষয়ে শিক্ষকদের সতর্ক হইবার প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোনক্রমেই স্বাবলম্বীনীতির বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত হইবে না।

বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম (Courses of Basic Education)

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যক্রম আলোচনা প্রসঙ্গে কমিটী স্থির করেন যে মূল শিল্প ছাড়া, মাতৃভাষা, গণিত, সামাজিক জ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, অঙ্কন বিদ্যা, সঙ্গীত এবং হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে। কমিটী প্রত্যেকটি পাঠ্যবিষয়ের শিক্ষার মান, উদ্দেশ্য ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। নিম্নে উহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

১। মূল শিল্প (The Basic Craft) :

বুনিয়াদী পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত শিল্পগুলি মূল শিল্প হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১) সূতা কাটা ও বয়ন।

(২) কাষ্ঠশিল্প।

(৩) কৃষি শিল্প।

(৪) উদ্যান নির্মাণ (ফলের বাগান ও সব্‌জীর বাগান)।

(৫) চর্ম শিল্প। অথবা,

(৬) অন্য কোন শিল্প যাহা স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষা প্রদানের উপযোগী বিবেচিত হইবে।

'মূলশিল্প' এরূপভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে কেহ ঐ শিল্পকে জীবিকা অর্জনেব উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে 'তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন'কে মূল শিল্প হিসাবে গ্রহণ করিবে না,—সেখানেও তকলীর সাহায্যে সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন ও স্থানীয় প্রয়োজনীয় কৃষিকার্য শিক্ষা দেওয়া উচিত।

২। মাতৃভাষা

উপযুক্তভাবে মাতৃভাষা শিক্ষার উপরেই সর্ববিধ শিক্ষার মান নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যও মাতৃভাষা শিক্ষা প্রয়োজন। কমিটীর মতে সাত বৎসর বুনিয়াদী শিক্ষার পরে মাতৃভাষার দক্ষতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত মান আশা করা যাইতে পারে।

(১) শিক্ষার্থীর পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করিবার যোগ্যতা অর্জন।

(২) দৈনন্দিন যে কোন বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোচনার যোগ্যতা অর্জন।

(৩) নীরব ও সরব ভাবে পাঠের যোগ্যতা অর্জন।

(৪) পুস্তক পাঠ, অভিধান পর্যালোচনা, এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুস্তক হইতে নূতন বিষয় সম্পর্কে সাহায্য গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন।

(৫) উপযুক্ত দ্রুততার সঙ্গে লিখিবার ও পড়িবার যোগ্যতা অর্জন।

(৬) চিঠিপত্র লিখিবার ক্ষমতা অর্জন।

(৭) মাতৃভাষার বিখ্যাত লেখকদের রচনা পাঠ এবং ঐ সম্পর্কে আলোচনার ক্ষমতা অর্জন।

৩। গণিত

মূল শিল্প এবং শিক্ষার্থীর পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য সংখ্যা ও জ্যামিতির জ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। শিক্ষার্থীকে ব্যবসার মূল নীতি এবং হিসাবপত্র রাখিবার পদ্ধতি সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে।

৪। সামাজিক শিক্ষা (Social Studies)

ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা এই বিষয়ের অন্তর্গত হইবে। সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যে ইহার সাহায্যে বিভিন্ন দেশ, ব্যক্তি, সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি সত্য জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইবে।

৫। সাধারণ বিজ্ঞান (General Science)

'সাধারণ বিজ্ঞান' বিষয়টি বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখাগুলির সমন্বয়ে গঠিত হইবে। (ক) প্রকৃতি পাঠ, (খ) উদ্ভিদ বিজ্ঞান, (গ) প্রাণী-বিদ্যা, (ঘ) শারীরতত্ত্ব, (ঙ) স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও শরীর চর্চা, (চ) রসায়ন বিদ্যা, (ছ) জ্যোতির্বিদ্যা, (জ) বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের জীবন চরিত ও নানাবিধ আবিষ্কারের গল্প। বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল—পারিপার্শ্বিক বস্তুজগত সম্পর্কে একটি সত্যদৃষ্টি লাভে সাহায্য করা।

৬। অঙ্কন বিদ্যা (Drawing).

অঙ্কন বিদ্যার পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(১) পাঠ্য পুস্তকের পঠিত বিষয় ও ঘটনার চিত্র অঙ্কন।

(২) বিদ্যালয়ের আশেপাশের দৃশ্য ও বস্তু অঙ্কন।

(৩) কল্পনার সাহায্য লইয়া নানা বিষয় অঙ্কন।

শিল্প শিক্ষা, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া অঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

'অঙ্কন বিদ্যা'র পাঠ্যক্রম এইরূপ হইবে যে প্রথম চারি বৎসরে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রকৃতি পাঠের বিভিন্ন বিষয়, এবং শিল্প কাযের বিভিন্ন বিষয় অঙ্কন করিতে শিক্ষা লাভ করিবে। পরবর্তী তিন বৎসরে নানা প্রকারের চিত্ররূপ (design) অঙ্কন, বিদ্যালয় গৃহ প্রভৃতি সজ্জিতকরণ, (decoration) এবং যান্ত্রিক অঙ্কন (mechanical drawing) প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। শেষ তিন বৎসরে অঙ্কন বিদ্যা শিক্ষার মান এইরূপ হইবে যে ছাত্রেরা নানাবিধ কার্যের উপযোগী অঙ্কন নিজেরাই করিতে পারিবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অঙ্কন শিক্ষার মান সম্পর্কে বলা হইয়াছে— অঙ্কন শিক্ষার মান এইরূপ হইবে যে ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থীর

(১) পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি এবং বর্ণের গভীরতা ও বস্তুর আকার সম্পর্কে বোধ-শক্তি অর্জিত হইবে।

(২) কল্পনার সাহায্যে নানাবিধ বস্তু ও বিষয় অঙ্কনের দক্ষতা লাভ হইবে।

(৩) শিল্পের গুণাগুণ বিচারের দক্ষতা অর্জিত হইবে।

(৪) রুচিসম্মত ভাবে কারুকার্য অঙ্কন এবং সুন্দর ভাবে সজ্জিত করণের ক্ষমতা জন্মিবে।

৭। সঙ্গীত

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সঙ্গীতকে একটি বিশিষ্ট স্থান প্রদান করা হইয়াছে। সঙ্গীতের সাহায্যে শিক্ষার্থীর ছন্দ ও তালের জ্ঞান জন্মিবে। শিক্ষার্থীকে কয়েকটি বিখ্যাত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত শিক্ষা দিতে হইবে এবং সঙ্গীতের বর্ণনা ও শব্দ সম্পর্কে তাহাকে প্রকৃত ধারণা দিতে হইবে। বিদ্যালয়ে সমবেত সঙ্গীতে বিশেষ জোর দিতে হইবে।

৮। হিন্দুস্থানী ভাষা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভাব বিনিময়ের বাহন হিসাবে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অবশ্যই হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে অঞ্চলে হিন্দী মাতৃভাষা—সেই অঞ্চলে হিন্দুস্থানী ভাষা অবশ্যই শিক্ষার বাহন হইবে। প্রয়োজন বোধে নাগরী অথবা আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ভাষা এইরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যে ইহার সাহায্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব হয়। যে সমস্ত অঞ্চলে অন্য ভাষা প্রচলিত, সেইস্থানে ৫ম ও ষষ্ঠ মানে হিন্দুস্থানী অবশ্য পাঠ্য ভাষা হিসাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

উপরে আলোচিত বিষয় ও পাঠ্যক্রম সাধারণভাবে বালক ও বালিকা উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য হইলেও সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইবে। ৪র্থ ও ৫ম মানের ক্ষেত্রে বালিকাদিগকে সাধারণ বিজ্ঞানের পরিবর্তে 'গৃহ-বিজ্ঞান' শিক্ষা দিতে হইবে এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম মানের ক্ষেত্রে বালিকাদিগকে 'মূলশিল্পের' পরিবর্তে 'গৃহ বিজ্ঞানের' 'উচ্চতর বিষয়' শিক্ষা দিতে হইবে।

বুনিয়াদী-শিক্ষা পদ্ধতি (Method of Teaching)

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এই পদ্ধতিতে একটি প্রধান শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে মূল শিল্পের প্রাধান্য খুব বেশি। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের 'সময় পত্র' (time table) আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

সময় পত্র।

মূলশিল্প—	৩ ঘ. ২০ মিঃ
সঙ্গীত ও গণিত	৪০ মিঃ
মাতৃভাষা	৪০ „
সমাজ শিক্ষা ও সাধারণ বিজ্ঞান	৩০ „
শরীর চর্চা	১০ „
বিশ্রাম	১০ „
মোট	৫ ঘ. ৩০ মিঃ।

যদিও উপরের 'সময় পত্র' 'সুতা প্রস্তুত ও বস্ত্রবয়ন' শিল্পকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে, তবে কমিটী মনে করেন অন্য শিল্পের ক্ষেত্রেও সময়ের বিশেষ পরিবর্তন হইবে না।

বুনিয়াদী পরিকল্পনায় মূল শিল্পটিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই বিষয় লইয়া বুনিয়াদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে বুনিয়াদী পরিকল্পনার জনক গান্ধীজীর মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গান্ধীজী বলেন যে বর্তমানে যে ভাবে যান্ত্রিকভাবে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয় তাহা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে। শিল্পকে আরও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অর্থ এই যে ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থী যে কেবলমাত্র

শিল্পের প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করিবে তাহা নহে। শিল্পের ইতিহাস ও জাতীয় জীবনে উহার প্রভাব সম্পর্কেও তাহাকে জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। গান্ধীজী মনে করেন যে শিক্ষার্থীর মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ একমাত্র এইভাবেই সম্ভব। গান্ধীজীর মতে হস্তের অর্থাৎ কর্মের সাহায্যেই মস্তিষ্কের অর্থাৎ বুদ্ধির বিকাশ সাধন করা প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় এই প্রণালীর সাহায্যে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে সেই সম্পর্কেও গান্ধীজী কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে উহা উল্লেখ করিতেছি।

বর্ণ-পরিচয় সম্পর্কে গান্ধীজী বলিয়াছেন উহা পৃথক ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। তবে যখন শিক্ষার্থী শরীরে ও মনে কিছু পূর্ণতা অর্জন করিয়াছে তখনই উহা শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইভাবে শিক্ষা দিলে বর্তমান অপেক্ষা বহু সময় বাঁচানো যাইবে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী লিখিবার ও পড়িবার যোগ্যতা অর্জন করিবে।

গণিত শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে গান্ধীজী বলিয়াছেন—শিল্প শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহা শিখাইতে হইবে। **সংখ্যা ও গণনা** শিক্ষা প্রদানের জন্য সূতার দৈর্ঘ্য ইত্যাদি হিসাব করিবার সময় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। জ্যামিতির বিভিন্ন বিষয়বস্তু শিক্ষাপ্রদান সম্পর্কে গান্ধীজী বলিয়াছেন,—তকলীর বিভিন্ন অংশের সাহায্যে জ্যামিতি সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। যেমন তকলীর চাকতির (disc) সাহায্যে বৃত্তের জ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে। গান্ধীজী লিখিয়াছেন, আমি এই-ভাবে ইউক্লিডের নাম উল্লেখমাত্র না করিয়া বৃত্তের সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা দিতে পারি।

ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন—সূতা প্রস্তুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়গুলি নানা আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা

দেওয়া যাইতে পারে। কারণ তুলার সাহায্যে সুতা প্রস্তুত ও বস্ত্র-বয়নের ইতিহাস মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। পুঁথির সাহায্যে ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার চেয়ে এই পদ্ধতির সাহায্যে ইতিহাস ও ভূগোলের প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজেই প্রাপ্ত করা সম্ভব।

বুনিয়াদী পদ্ধতি সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন—বুনিয়াদী পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা ভিন্নতর বলিয়া জনসাধারণের পক্ষে ইহাকে সহজভাবে গ্রহণ করা অসুবিধাজনক হইতে পারে। এই পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই। আমাদের একটি নূতন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া এই পদ্ধতির গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে হইবে। গান্ধীজী তাহার দক্ষিণ আফ্রিকাবাসকালে এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। শিক্ষকেরা যদি দরদ ও বিশ্বাস লইয়া এই পদ্ধতির পরীক্ষাকার্য চালাইয়া যান—তবে তাহারাও নিশ্চয়ই এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবেন। গান্ধীজীর মত এই যে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কালে শিক্ষকদের উচিত হইবে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় মূল শিল্পের সহিত যোগ রাখিয়া শিক্ষাদান করা। যে সমস্ত বিষয় ঐভাবে যোগ করা সম্ভব হইবে না,—সেই বিষয়গুলির শিক্ষাদানও সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা যাইতে পারে। শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইলে ঐ বিষয়গুলি তাহারা পরে মূল শিল্পের সহিত যোগ করিয়া শিক্ষাদান করিতে পারিবেন। বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির ভিতর বৈপ্লবিক শক্তি রহিয়াছে, উহার দিকে গান্ধীজী শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বুনিয়াদী পরিকল্পনায় পরীক্ষা

বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতি নানা কারণে গ্রহণযোগ্য নহে।

বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির নির্ভরশীলতা (reliability) সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। সুতরাং প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে বুনিয়াদী পরিকল্পনায় ভিন্ন উদ্দেশ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। বুনিয়াদী পরিকল্পনায় দুইটি উদ্দেশ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

প্রথমত কোন অঞ্চলের বিভিন্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের মধ্যে যোগ্যতার মান নিরূপণের জন্য। এই উদ্দেশ্যে নমুনা পরীক্ষার (sample measurement) ব্যবস্থা করিয়া বিদ্যালয়সমূহের যোগ্যতার মান নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই পরীক্ষা স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ দ্বারা গৃহীত হইবে এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে বিষয়মুখী (objective) পরীক্ষার অভীক্ষা (tests) প্রস্তুতকরণের ভিত্তিতে নির্মিত হইবে। সুতরাং এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সমগ্র পাঠ্যক্রমই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের মান নিরূপণ করা সম্ভব হইবে এবং সেই অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যাইবে। মানোন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণীর (final class) কার্যকাল আরও ছয় মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই ছয় মাসের অতিরিক্ত সময়ে মূলশিল্প সম্পর্কে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে হইবে (ইহা অবশ্য শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ভেদে বিভিন্ন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট হইবে) এবং গ্রামোন্নয়ন কাযে ব্যয় করিতে হইবে।

বিভিন্ন ছাত্রদের জন্য শিক্ষকেরা 'উন্নতি জ্ঞাপক বিবরণ পত্র' (Cumulative Record Cards) প্রস্তুত করিবেন এবং এক শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নয়ন উক্ত বিবরণপত্রের ভিত্তিতেই করিতে হইবে। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মান নির্ণয়ের জন্য নমুনা পরীক্ষার পদ্ধতি (sample testing) গ্রহণ করিবেন এবং উহার ফল অনুসারে বিদ্যালয়ের মান স্থির করা হইবে। যদি কোন শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তবে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের

যোগ্যতার মান পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের গুণাগুণ পরীক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। অথবা যে সাধারণ মান (norm) এর ভিত্তিতে যোগ্যতার বিচার করা হইবে—সেই সম্পর্কে আরও বেশি অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং এই অনুসন্ধানের ফলাফলের ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম ও সাধারণ মান (norm) ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

বিদ্যালয়ের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য শিক্ষাকর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিবেন।

(১) নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের উপর,

(২) মূল শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার উপর,

(৩) বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গ্রামোন্নয়নে কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছে উহার বিবরণের উপর,

(৪) জেলা ভিত্তিতে যে হস্তনির্মিত শিল্পের প্রদর্শনী হইবে উহাতে প্রদর্শিত দ্রব্যের উৎকর্ষতার উপর।

বিদ্যালয় পরিচালনা এবং সংগঠন (organisation and administration)

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাত বৎসর পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে কাটাইতে হইবে। এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হইবে এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য একই প্রকারের মান নির্দিষ্ট হইবে। তবে কোন ক্ষেত্রে কোন অভিভাবক যদি তাহার কন্যাকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে রাখিতে না চাহেন তবে বার বৎসর পর্যন্ত শিক্ষার পর অভিভাবক উক্ত ছাত্রীকে বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইতে পারিবেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় যদিও সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তবুও উক্ত পরিকল্পনায় তাহার পূর্বেও বালক-বালিকাদের শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। 'পূর্ব বুনিয়াদী শিক্ষার' পরিচালনা ব্যবস্থা সাধারণ ভাবে রাষ্ট্রের হস্তেই থাকা উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের আর্থিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ঐ সম্পর্কে বুনিয়াদী শিক্ষার বর্তমান পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয় না।

জাকীর হোসেন কমিটীর মতে 'সমাজ জীবনের' সহিত সম্পর্কযুক্ত বুনিয়াদী শিক্ষার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা যদি গ্রহণ করা হয় এবং ভবিষ্যৎ বিদ্যালয়সমূহ এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনা বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থাকেও বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।

কার্যকাল

পূর্বেই বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার সময়পত্র (time table) এর আলোচনা করা হইয়াছে। কমিটীর মতে মোট ২৮৮ দিন বিদ্যালয়ের কার্য চলিবে এবং মাসে গড়ে ২৪ দিন বিদ্যালয় খোলা থাকিবে।

একাধিক শিল্প শিক্ষা

শিক্ষার শেষ দুই বৎসর একটি শিল্পের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী একাধিক শিল্পের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একখণ্ড খোলা জমি থাকিবে। উহার এক অংশে কৃষিকার্য ও উদ্যান নির্মাণ করা হইবে এবং অন্য অংশে খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকিবে।

বিদ্যালয়ে জলযোগ

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দৈনন্দিন জলযোগের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ঐ সম্পর্কে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে।

শ্রেণী গঠন

প্রত্যেক শ্রেণীতে গড়ে ৩০ জন ছাত্র থাকিবে। কোন ক্ষেত্রেই এই সংখ্যা অতিক্রম করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকারের খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। খেলা দুই প্রকারের হইবে,—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। খেলা নির্বাচনে একটি বিশেষ কথা সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে যে যে সমস্ত বিদ্যালয়ে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় (Activity School), 'খেলা' সেইখানে সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির একটি প্রধান অঙ্গ। কোন খেলাকেই শিক্ষাব সহিত বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করা উচিত নহে।

শিক্ষক নির্বাচন ও শিক্ষকদের যোগ্যতা

শিক্ষক নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে। বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনা একটি অভিনব তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। এই কারণে ইহার উপযুক্ততা উপযুক্ত শিক্ষকদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষক নির্বাচনে পরিকল্পনা কমিটীর মত এই যে উক্ত কার্যে স্থানীয় উপযুক্ত ব্যক্তিদের আবেদন সর্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে। মহিলাদের এই শিক্ষাদান কার্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে হইবে।

যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনে একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ শিক্ষাদান এমন একটি কার্য যে কার্যে বিশেষ প্রকারের সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক গুণের প্রয়োজন হয়। কমিটীর মতে সামাজিক গুণসম্পন্ন (social type) ব্যক্তিদেরই এই কার্যে নিয়োগ করা উচিত।

পরিকল্পনা সম্পর্কে গবেষণা (Research)

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতি হইতে একেবারে

স্বতন্ত্র। ইহা এক সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনা। সুতরাং এই পদ্ধতির গুণাগুণ সম্পর্কে যথেষ্ট পরীক্ষার প্রয়োজন। পাঠ্যক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সামাজিক জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ, শিশু-মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় গবেষণা পরিষদ স্থাপনের প্রয়োজন। শিক্ষাকে জাতীয় উন্নতির প্রধান অবলম্বন হিসাবে পরিচালিত করিতে হইলে প্রতিনিয়ত গবেষণার দ্বারা উহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে রুশো হইতে গান্ধী পর্যন্ত এই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে শিক্ষার যে সমস্ত নূতন নূতন পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহাতে শিক্ষার সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। এই সম্পর্কে নব নব গবেষণা ও পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা যোগে শিক্ষাকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার প্রয়োজন আছে। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা লইয়া নানাবিধ সমালোচনা হইতেছে। কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ইহা এখনও ইহার পরীক্ষামূলক স্তর (experimental stage) অতিক্রম করে নাই।

বুনিয়াদী শিক্ষা-বিচার

শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা, প্রোজেক্ট পদ্ধতি, কংগ্রেস জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর রিপোর্ট ও বুনিয়াদী শিক্ষা, সোভিয়েট রাশিয়ার অভিজ্ঞতা, অর্থকরী কাজ ও সৃজনমূলক কাজ, সার্জেণ্ট পরিকল্পনা, মূল শিল্প নির্বাচন, স্বাবলম্বী শিক্ষা, রাষ্ট্রের দায়িত্ব, উচ্চশিক্ষার সহিত সম্পর্ক, হিন্দুস্থানী ভাষার স্থান, গবেষণার প্রয়োজনীয়তা।

পূর্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ঐ সম্পর্কে কোনরূপ সমালোচনা আমরা উল্লেখ করি নাই। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার গুণাগুণ লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী প্রভৃতির রিপোর্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পর বহু শিক্ষাবিদ এই সম্পর্কে নানা আলোচনা করিয়াছেন। সেই সমস্ত আলোচনা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া সমালোচনা করা হইয়াছে।

(১) শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিল্প-কেন্দ্রিক শিক্ষা।

(২) মূল শিল্প নির্বাচনের ত্রুটি।

(৩) বুনিয়াদী শিক্ষার স্বাবলম্বী নীতি (Self supporting scheme)।

(৪) রাষ্ট্র ও শিক্ষার দায়িত্ব।

(৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও অন্যান্য ভাষার স্থান।

(৬) বুনিয়াদী শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা।

বুনিয়াদী শিক্ষার সমর্থক শিক্ষাবিদগণ বলেন যে বুনিয়াদী শিক্ষানীতি শিশু মনস্তত্ত্বসম্মত; কারণ এই পদ্ধতিতে শিশুর পরিবেশের সহিত সম্পর্কযুক্ত একটি প্রধান শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। ইহাতে লব্ধজ্ঞান শিশুর অভিজ্ঞতার সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় ইহা শিশুর প্রকৃত জ্ঞানরূপে পরিগণিত হয়। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে পুঁথির সাহায্যে যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা কোন ভাবেই শিশুর নিজস্ব জ্ঞান নহে। এই বিদ্যা অর্জনের জন্য শিশু একমাত্র তাহার স্মরণশক্তির উপরই নির্ভর করে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় এই জ্ঞান তাহার বিশেষ কাজে আসে না। জাকীর হোসেন কমিটীর

রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে শিক্ষাবিজ্ঞানীদের নিকট মহাত্মাজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার কোন নূতনত্ব নাই। সকলেই জানেন প্রকৃত শিক্ষা একমাত্র কাজের মাধ্যমেই দেওয়া যাইতে পারে। শিশুরা সাধারণতঃ নানা কাজ করিতে ভালবাসে, নানা জিনিষ ভাঙিতে ও গড়িতে পছন্দ করে। এই ভাবে প্রকৃতি (Nature) তাহাদিগকে শিক্ষা দেয়। শিশুদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে পুঁথির সামনে বসাইয়া রাখা খুবই অন্যায়। এই কারণে বহু শিক্ষাবিদ শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রণালীকে আমেরিকায় বলা হয় **প্রোজেক্ট পদ্ধতি** (Project method) এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় এই পদ্ধতির নামকরণ করা হইয়াছে **বহুমুখী পদ্ধতি** (Complex method)।

কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর রিপোর্টে (এই রিপোর্ট অন্যত্র দ্রষ্টব্য) বুনিয়াদী শিক্ষার 'শিল্প-কেন্দ্রিকতা' সম্পর্কে মন্তব্য করা হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রথম হইতেই শিশুকে একটি বিশেষ শিল্প শিক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে বলিয়া মনে হয়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয় যথা,— গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ঠিকভাবে শিক্ষা প্রদান করা কঠিন হইবে। এই পরিকল্পনায় শিশুকে প্রথম হইতেই একটি কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা করিতে বলা হইয়াছে এবং এই কারিগরী শিক্ষাকেই শিক্ষার প্রধান বিষয় হিসাবে ধরা হইয়াছে। এমন একটি শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে বলা হইয়াছে, যে শিল্প শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনে প্রয়োজন হইলে জীবিকা অর্জনের উপায় স্বরূপ হইবে। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা কমিটীর মতে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-জীবনের প্রারম্ভেই কোন অর্থকরী শিল্প-শিক্ষার উপর এইরূপ জোর

প্রদান করা শিক্ষানীতির দিক হইতে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে। বিশেষ করিয়া একটি সঙ্কীর্ণ মাধ্যমের সাহায্যে জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করিলে শিশুর জ্ঞান অগভীর ও ত্রুটিপূর্ণ হইতে বাধ্য।

এই সম্পর্কে সোভিয়েট রিপাব্‌লিকের অভিজ্ঞতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েট রাশিয়াতেও এইরূপ শিল্পের সাহায্যে পদার্থবিদ্যা, গণিত প্রভৃতি শিক্ষাপ্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ পদ্ধতি সম্পর্কে ঐ দেশের অভিজ্ঞতা এই যে এইভাবে শিক্ষা দিলে শিক্ষায় ত্রুটি থাকে। বর্তমানে সোভিয়েট বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং শিক্ষাদান কার্যে পুরাতন পদ্ধতির অনুসরণ করা হইতেছে।

'কার্যের মাধ্যমে শিক্ষা' শিশু শিক্ষার জন্য একটি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সন্দেহ নাই। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে এই নীতির গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে জাকীর হোসেন কমিটীর মতামত আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 'শিশুদের এক স্থানে বসাইয়া বই পড়িতে বাধ্য করানো হিংসামূলক।' এই উক্তির যৌক্তিকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু দৈনিক সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরিয়া চরকা কিংবা তকলীর সাহায্যে সূতাকাটা শিশুমনের নিকট কতখানি গ্রহণযোগ্য —এই সম্পর্কে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন আছে।

শিক্ষাবিজ্ঞানীদের নিকট কাজের প্রকৃতি দুই প্রকারের—অর্থাৎ অর্থকরী কাজ (Productive work) এবং সৃজনমূলক কাজ (Creative work)। শিশুর নিকট সৃজনমূলক কাজেরই আবেদন বেশি। অর্থকরী কাজের মূল্য বয়স্কদের নিকট। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় অর্থকরী কার্যকে সৃজনমূলক কার্য হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু দুইটির প্রকৃতি বিভিন্ন। অর্থকরী কার্য মানুষকে যন্ত্রের মত করিয়া

তোলে। কিন্তু সৃজনমূলক কার্য আনন্দের মাধ্যমে মানুষের সৃজন শক্তিকে বিকশিত করিতে চেষ্টা করে। শিশু আপন মনের আনন্দে জিনিষ গড়িবে এবং ভাঙ্গিবে,—আবার গড়িবে এবং এইভাবে নানা কাজের মধ্য দিয়া তাহার শিক্ষা হইবে সম্পূর্ণ। যে সমস্ত কার্যের মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আছে,—শিশুশিক্ষার জন্য ঐ প্রকারের কার্য সবিশেষ উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—'খেলাধুলা' শিশুর জীবনে ঐ প্রকারের কার্য। কারণ ইহার সাহায্যে আনন্দের মাধ্যমে শিশুর সৃজনমূলক শক্তির বিকাশ সাধিত হয়।

প্রত্যেক দেশেই স্বীকার করা হয় যে বার বৎসরের পূর্বে শিশুকে অর্থকরী কার্যে নিযুক্ত করা অনুচিত। বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট কার্য শিশুমনের পক্ষে বিপজ্জনক। শিশুর শরীরের অস্থি ও পেশী এই বয়সে খুবই কোমল থাকে। সুতরাং শিশু বয়সে তাহাকে কোন পরিশ্রম-মূলক কঠিন কার্যে নিযুক্ত করিলে তাহার শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে। এই জন্য বহু দেশে শিশুশ্রমিক নিয়োগ বেআইনি। সাত আট বৎসরের ছেলে-মেয়েদের সুতাকাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি অর্থকরী কার্যে নিযুক্ত করিলে প্রকৃত শিক্ষার চেয়ে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের দিকেই বেশি জোর পড়িবে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কেহ কেহ বাল্যকাল হইতে ছাত্রছাত্রীদের অর্থকরী কার্যে নিয়োগকেই অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন।

উপরে আমরা শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুমনের বৈশিষ্ট্যকে কতখানি মূল্য দেওয়া হইয়াছে—সেই সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মতামত উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু শিশু-মনস্তত্ত্ব ছাড়াও শিল্পের একটি শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে। বুনিয়াদী পরিকল্পনায় যে ভাবে শিল্প নির্বাচন করা হইয়াছে তাহাতে এই শিক্ষাগত যোগ্যতার কতটুকু মূল্য দেওয়া হইয়াছে সেই সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হইবে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ অর্থাৎ মনুষ্যত্ব লাভ। গান্ধীজী বলিয়াছেন—শিক্ষার লক্ষ্য হইবে ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ,—নিজের দিক হইতে,—সমাজের দিক হইতে। বর্তমান শিক্ষা পরিকল্পনার প্রধান ত্রুটি এই যে এই শিক্ষা শিশুকে সমাজ ও পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে শিক্ষা দেয়। এই যে আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ইহা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে। দ্বিতীয়ত বর্তমান শিক্ষানীতি বিদেশী শাসকগণ কর্তৃক বিদেশী শাসনকে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হইয়াছে। এই যে কেরানী-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি চলিতেছে—ইহার সাহায্যে যেমন বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে,—তেমনি এই শিক্ষার ফলে জনসাধারণের মনে কায়িকশ্রম ও মানসিক শ্রমের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজ জীবনের উপযুক্ত হইবার শিক্ষা দেয় না, মানুষের জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে না এবং শিক্ষার্থীকে পরিবার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "আত্মসর্বস্ব" হইতে শিক্ষা দেয়,—সেই শিক্ষা বর্তমানে কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে। বুনিয়াদী শিক্ষানীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল শিক্ষার এই ত্রুটিকে দূর করা।

এই দিক হইতে চিন্তা করিলে বুনিয়াদী পরিকল্পনায় শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেকেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু একটি বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব কিনা,—এই সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মনে বহু সন্দেহ আছে। অনেকে মনে করেন শিশুমনের বিকাশের দিক হইতে এই নীতি বিপজ্জনক। শিক্ষাকে কার্যকরী করিতে হইলে শিশুর অভিজ্ঞতার সহিত ইহাকে যুক্ত করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি মাত্র শিল্প বিশেষ করিয়া তকলী বা

চরকার সাহায্যে সুতাকাটার ভিতর দিয়া শিশুকে নানা বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে—এই নীতি অনেকের নিকট ‘কাজের মাধ্যমে শিক্ষা’ (Learning by doing) এই নীতি প্রয়োগ সম্পর্কে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় মনোবিজ্ঞানের মর্যাদা কতটুকু রক্ষিত হইয়াছে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে একজন লেখক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—“এই পরিকল্পনায় এইরূপ বলা হইয়াছে যে একটি মূল শিল্পের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। ইহা শিশু মনস্তত্ত্বের এক স্থূল প্রয়োগ। বর্তমানে একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালীর সাহায্যে যেমন পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন অংশ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়, একটি শিল্পের মাধ্যমে সমস্ত বিষয় সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। মূল শিল্পের সহিত সমস্ত পাঠ্য বিষয়ের যে গভীর যোগাযোগ থাকিবে—এইরূপ আশা করাও ঠিক নহে। শিক্ষা শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় যে একটি মাত্র শিল্পের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইতে হইবে—এই ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভুল।” (P. S. Naidu—Visva Varati Quarterly 1947)

কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে জাকীর হোসেন কমিটী রচিত পাঠ্য-তালিকা মোটামুটি সন্তোষজনক বলা হইলেও উহাতে কিছু কিছু ত্রুটিও তাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহারা মন্তব্য করিয়াছেন—‘বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে বীজগণিতের একটি বিশেষ স্থান আছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশসমূহে পাটীগণিত ও বীজগণিত একই সঙ্গে যত অল্প বয়স হইতে সম্ভব শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের বিদ্যালয় সমূহের জন্যও এই নিয়ম গ্রহণ করা উচিত। পাটীগণিতের বহু সমস্যামূলক অঙ্ক (problems) বীজগণিতের চিহ্ন

ও সমীকরণের সাহায্যে সহজেই সমাধানযোগ্য। আর বীজগণিত শিক্ষাদান কোন একটি শিল্পের মাধ্যমে আদৌ সম্ভবপর নহে।"

সার্জেণ্ট পরিকল্পনা (১৯৪৪) ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি সাধারণ ভাবে মানিয়া লইলেও—উহার কোন কোন বিষয়ের পরিবর্তনের জন্য তাহারা সুপারিশ করিয়াছেন। সার্জেণ্ট পরিকল্পনাতে বলা হইয়াছে যে গ্রামাঞ্চলেই প্রথমে বুনিয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। শিক্ষার্থীর ১১+বৎসর বয়সে অন্য ধরণের বিদ্যালয়ে পড়িবাব সুযোগ থাকা উচিত। নিম্নশ্রেণীতে নানা প্রকাবেব হাতের কাজ এবং উচ্চশ্রেণীতে একটি মাত্র শিল্প শিক্ষা দেওয়া উচিত। পাঠ্যতালিকার যে সমস্ত বিষয় শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে না তাহা পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

আমরা দেখিতেছি বুনিয়াদী পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষার যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে,—এই সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মধ্যে মতদ্বৈত আছে। মূলশিল্পের প্রাধান্য সম্পর্কে অনেকে বলেন যে বিষয়টিকে সামাজিক দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ অধুনিক বিদ্যালয় আমাদের সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ (Institution)। শিশুকে বৃহত্তর সমাজ জীবনের জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাও বিদ্যালয়ের অন্যতম কার্য। এই কার্যকে সুষ্ঠুভাব সম্পাদনের জন্য বিদ্যালয়কে আরও সমাজের নিকটে আসিতে হইবে, অর্থাৎ সমাজের বহু বৈশিষ্ট্য বিদ্যালয়ে আমদানী করিতে হইবে। বৃহত্তর সমাজ জীবনে যখন অর্থকরী শিল্পের প্রাধান্য রহিয়াছে,—বিদ্যালয়েও ঐ কারণে উহা প্রবর্তন করিতে হইবে। ইহাতে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে তাহা সূক্ষ্মতর হইবে।

সমাজ জীবনের উপযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষার একটা উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু একটি সামাজিক অর্থকরী শিল্প কি ভাবে এই শিক্ষা

প্রদান করিতে পারে এই সম্পর্কে অনেকের বহু সন্দেহ আছে। বিদ্যালয়ে শিশু এমন এক পরিবেশ দাবী করে যেখানে সে তাহার পারিপার্শ্বিক বস্তু ও অবস্থা সম্পর্কে নানাভাবে পরীক্ষা ও বিচার করিতে পারে। যে সমস্ত বস্তু বা বিষয় শিশুর প্রত্যক্ষ পরিবেশের বাহিরে রহিয়াছে সেই সম্পর্কেও চিন্তা করা এবং ঠিক ভাবে বিচার করিবার শক্তিও তাহার অর্জন করিতে হইবে। বিদ্যালয় সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ হইলেও ইহা সমাজ হইতে অনেক ভাবে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং শিশুকে সামাজিক গুণ অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সমাজের বিভিন্ন কার্যে লিপ্ত হইত হইবে—ইহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। ববং চিন্তা ও বিচারের সাহায্যে সামাজিক গুণ তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। সহযোগিতা, পরস্পরেব প্রতি প্রীতিব ভাব বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রদের একত্রে মিলনের ফল। সামাজিক কোন অর্থকরী কাজ ছাড়া ইহা সম্ভব নহে এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক নহে। বিদ্যালয়ের কর্তব্য হইতেছে শিক্ষার্থীকে এমন একটি সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রাখা যেখানে নানাবিধ কর্মেব মাধ্যমে তাহাদের অভিজ্ঞতা অর্জিত হইতে পারে এবং সামাজিক জ্ঞানের উন্মেষ হইতে পারে।

বুনিয়াদী পরিকল্পনার সাহায্যে এইরূপ কিছু কবা সম্ভব কিনা তাহা আমাদের বিচার করিতে হইবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এই অবস্থা প্রবর্তন করিতে হইলে নানা বিষয় লইয়া শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিচারের সুযোগ দিতে হইবে। শিশুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয় কি ভাবে নূতন নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিবে—এই সম্পর্কে অনেকের পরিষ্কার কোন ধারণা নাই। শিক্ষায় যে 'ব্যক্তি পার্থক্যেব' (Individual differences) বিশেষ স্থান আছে—বুনিয়াদী পদ্ধতিতে তাহার মর্যাদা কি ভাবে রাখা সম্ভব—এই সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

মূল শিল্প (Basic craft) নির্বাচন সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ইহা বিশেষ চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে হইবে। শিল্পটি যেন এইরূপ হয় যাহাতে ইহার সাহায্যে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় উপযুক্ত দক্ষতার সহিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। এই শিল্প নির্বাচনে শিক্ষার্থীর সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ ডিউই ও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাহার মতে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রদান করিতে হইবে।

১৯৩৮ সালে পুণায় অনুষ্ঠিত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে আলোচিত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রদেশের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 'সূতাকাটা ও কাপড়বোনা' কে একমাত্র মূল শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, যদিও বুনিয়াদী পরিকল্পনায় মূল শিল্পের তালিকায় চাষের কাজ, কাঠের কাজ, প্রভৃতি শিল্পেরও উল্লেখ আছে।

'জাকীর হোসেন কমিটী' মূল শিল্প নির্বাচনে শিশুর পরিবেশের উপর বিশেষ জোর প্রদান করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতের শতকরা ৭০ জন কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও,—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মূল শিল্প হিসাবে 'সুতাকাটা'কেই কেন গ্রহণ করা হইয়াছে—এই সম্পর্কে অনেকের জিজ্ঞাস্য আছে। চরকা কিংবা তকলীর সাহায্যে সুতাকাটা বা তাঁতের সাহায্যে বস্ত্রবয়নেব ভিতর দিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় কতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর—সেই সম্পর্কে মতদ্বৈত থাকিলেও এই কথা সত্য যে আমাদের দেশে শতকরা ৫ জনের বেশি বস্ত্রবয়নকে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে নাই। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষার মূল বক্তব্য যাহাই হউক না কেন, উহা যে দেশের শতকরা ৭০ জন শিক্ষার্থীর পরিবেশকে মূল শিল্প হিসাবে গ্রহণ করে নাই ইহা নিঃসন্দেহ। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে

বুনিয়াদী পরিকল্পনায় শিল্প নির্বাচনের নীতিতে অসামঞ্জস্য রহিয়াছে মনে হয়।

এই সম্পর্কে অন্য একটি প্রশ্ন বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। দেশের অধিকাংশ মানুষই যদি সুতাকাটা ও বস্ত্র-বয়নকে মূল শিল্প হিসাবে গ্রহণ করে এবং ইহার সাহায্যে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে, তবে কি সমগ্র দেশে একটি বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে একটি অস্বস্তিকর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইবে না? বর্তমানে বস্ত্রশিল্পে যে সমস্ত কর্মিরা কার্য করিতেছেন—তাহাদের পক্ষেই উপযুক্ত আয়ের সংস্থান করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় সমাজকে সহযোগিতার পরিবর্তে এক অস্বস্তিকব প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক কে, টি, শা' মন্তব্য করিয়াছেন যে 'বুনিয়াদী পরিকল্পনা সমগ্র দেশে এক অস্বস্তিকর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিবে এবং যাহারা কুটীর শিল্পের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করেন—তাহাদের বিশেষ ভাবে আঘাত করিবে।' অনেকের মতে অধ্যাপক শা' এর মন্তব্যে প্রকৃত কথা বলা হইয়াছে।

স্বাবলম্বী শিক্ষা অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের চেষ্টা বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী মন্তব্য করিয়াছেন—"শিক্ষার স্বাবলম্বীতা উহার মূল্য বিচারের জন্য প্রকৃত পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।" অবশ্য পরে গান্ধীজী স্বীকার করিয়াছেন যে বুনিয়াদী পরিকল্পনায় শিক্ষাকে যদি সম্পূর্ণরূপে স্বাবলম্বী করা সম্ভব নাও হয়, তবুও এই পদ্ধতির সাহায্যে যদি ছাত্র ছাত্রীরা কিছু আয়ের সংস্থান করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার সমর্থকেরা বলেন যে পাঠ্যাবস্থায় আয় করিবার সুযোগ পাশ্চাত্য দেশে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকার দরিদ্র পরিবারের বহু ছাত্র হোটেলে পরিচারকের কার্য করিয়া, কৃষি খামারে ভৃত্যের কার্য করিয়া এবং খবরের কাগজ বিক্রয় করিয়া নিজেদের লেখাপড়ার খরচ সংগ্রহ করে। আমাদের দেশেও কোন কোন বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের হাতের কাজ শেখানো হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের ব্যয়ের কিছু অংশ সংগ্রহ করা হয়। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে রাষ্ট্রের পক্ষে যথোপযুক্ত ভাবে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নহে। কিন্তু অর্থাভাবে শিক্ষা বন্ধ রাখা কোন ক্রমেই সমীচীন নহে। সুতরাং এইরূপ একটি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রয়োজন যাহার সাহায্যে শিক্ষাকে স্বাবলম্বী করা যাইতে পারে।

উক্ত স্বাবলম্বী নীতির মূল কথা এই যে 'প্রত্যেক সভ্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের'—এই নীতি ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে এবং ইহার সপক্ষে একমাত্র যুক্তি ভারতবর্ষের দারিদ্র্য। ১৯৩৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী লিখিয়াছেন, —"আমাদের বালকদের বুদ্ধি-শক্তির অপব্যয় হইতেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর উহারা জানে না উহাদের কি করিতে হইবে। যে শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর নীতিবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মপটুতার উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম, তাহাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনায় এমন একটি শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছে— যাহার সাহায্যে ভবিষ্যৎ শিক্ষিতদের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে।"

পরবর্তী সংখ্যায় এই সম্পর্কে গান্ধীজী আরও লিখিয়াছেন,—"শিশু ১৪ বৎসর বয়সে অর্থাৎ সাত বৎসর ব্যাপী পাঠ সমাপ্তির পর আর্থিক যোগ্যতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। রাষ্ট্র সাত বৎসরের একটি শিশুকে সাত বৎসর ব্যাপী শিক্ষা প্রদানের পর যখন তাহার পিতামাতার

নিকট ফিরাইয়া দিবে তখন পারিবারিক আয়ের সঙ্গে শিশুর আপন আয়ের অংশ যোগ হইবে। এই ভাবে শিক্ষা ও বেকার সমস্যার সমাধান একই সঙ্গে করা সম্ভব হইবে।" (হরিজন, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বুনিয়াদী শিক্ষার স্বাবলম্বী নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করিবার জন্য ঐ গুলি আলোচনা প্রয়োজন।

কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর শিক্ষা বিষয়ক সাব-কমিটীতে অধ্যাপক কে, টি, শা' এই নীতিকে 'বিনিময় ব্যবস্থা' (exchange motive) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত শিক্ষা কমিটীর মতে এই স্বাবলম্বী নীতি গৃহীত হইলে শিক্ষকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত শিক্ষাকে অবহেলা করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইয়া বিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হইবেন। ইহা হইলে অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীরা জীবনের প্রথম হইতেই লাভের মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

গান্ধীজীকে এই প্রসঙ্গে বহু প্রশ্ন করা হয়। একটি প্রশ্নে বলা হয় যে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি কল-কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবে না। সুতরাং স্বাবলম্বী নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। গান্ধীজী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সরকারী তহবিল হইতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রস্তুত দ্রবাদি ক্রয় কবা হইবে।

শিশুদের বয়স্কদের কার্যে নিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন—'ভগবান আমাদিগকে শুধু ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে কিংবা আনন্দে কাল কাটাইবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই; কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।"

বিদ্যালয়ে যদি লাভের মনোবৃত্তি প্রবেশ করে এবং রাষ্ট্রকে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য বিদ্যালয়ের আয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেই অবস্থায় অনেকে মনে করেন যে শিক্ষকেরা শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম কর্মচারীদের খুসি করিবার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেয়ে শিশুদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইয়া বেশি উৎপাদনের দিকে মন দিবেন। ইহার ফলে বিদ্যালয়ে কারখানার আবহাওয়া সৃষ্টি করা হইবে।

এই ধরণের সমালোচনাব উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছেন "আমাদের দৈনিক আট ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিতে হইবে। শ্রম করিলেই কেহ দাস হয় না—যেমন গৃহে পিতামাতার আজ্ঞা পালন করিলেই কেহ দাস হয় না। সুতবাং পরিকল্পিত বিদ্যালয় সম্পর্কে দাসত্বের প্রশ্নই আসে না।"

কিন্তু প্রত্যেক সভ্য দেশেই প্রাথমিক শিক্ষাব দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিদ্যালয়ের ব্যয় যদি ছাত্র-ছাত্রীদের পবিশ্রমলব্ধ অর্থ হইতে নির্বাহ করিতে হয় তবে রাষ্ট্রকে তাহার একটি প্রাথমিক দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওযা হয়। তবে কি রাষ্ট্রেব একমাত্র কার্য হইবে পুলিশ ও মিলিটাবী রাখা এবং জনসাধারণকে শাসন করা? দেশের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কার্যে বাষ্ট্রেব দায়িত্ব কি হইবে? শুধুমাত্র দেশের 'ল এণ্ড অর্ডার' রক্ষা করিতে পারিলেই কি দেশের চারিত্রিক সংস্কার সাধিত হইবে? আমাদের মনে হয় এই নীতি কোন গণতান্ত্রিক দেশেই গ্রহণযোগ্য নহে।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল বিপোর্টে উচ্চশিক্ষার সহিত বুনিয়াদী শিক্ষার কোন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা কবা হয় নাই। অনেকে মনে করেন বুনিয়াদী পবিকল্পনায় উচ্চশিক্ষাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক সভ্য দেশেই উচ্চশিক্ষার বিশেষ মূল্য দেওয়া হইতেছে। কোন জাতির পরিচয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চ চিন্তা ও মৌলিক

গবেষণার দ্বারা। বর্তমানে প্রত্যেক সভ্যদেশই উচ্চশিক্ষার জন্য প্রচুর ব্যয় করিয়া থাকে। কারণ উচ্চশিক্ষার প্রসারের উপরই দেশের সাংস্কৃতিক মান নির্ভর করে।

ভারতবর্ষ আজ এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশেব সহিত সমান তালে চলিতে হইলে, ভারতবর্ষকেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। যে শিক্ষা-পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষার স্থান খুব গৌণ, তাহা ত্রুটিপূর্ণ হইতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর মতামত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত উচ্চশিক্ষার সম্পর্ক নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—

উচ্চশিক্ষাব জন্য আমাদিগকে বেসরকারী প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হইবে। বিভিন্ন শিল্প, কারিগরী বিদ্যা, সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন এই ভাবে মিটাইতে হইবে। সরকাবী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একমাত্র কার্য হইবে পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যয় নির্বাহের জন্য তাহাদের নির্ভর কবিতে হইবে ছাত্রদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের উপর।”

বুনিয়াদী পরিকল্পনায় উচ্চ শিক্ষার স্থান নির্দেশ প্রসঙ্গে ‘হরিজনে’ গান্ধীজী আরও লিখিয়াছেন,—

“আমি কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতিতে একটি আমূল পবিবর্তন আনিয়া জাতীয় জীবনেব প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত কবিতে চাই। বিভিন্ন প্রকারের ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে। কিন্তু এই শিক্ষা বিভিন্ন শিল্পের সহিত এইরূপ ভাবে যুক্ত করিতে হইবে যে বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনানুসারে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থানুযায়ী ‘টাটা কোম্পানী’ রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে ‘ইন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যা’ শিক্ষা প্রদানের জন্য একটি ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ

চালাইতে পারে এবং 'মিল-মালিক সংঘ'ও নিজেদের প্রয়োজনে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। অন্যান্য শিল্পের পক্ষেও ঐরূপ আশা করা যাইতে পারে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের ব্যবসায়ের প্রয়োজনে উপযুক্ত লোক সরববাহের জন্য কলেজ খুলিতে পারে। ইন্‌জিনিয়াবিং ও কাবিগরী বিদ্যা ছাড়া আমাদের প্রয়োজন —কলা বিদ্যা, শারীব বিদ্যা এবং কৃষি সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা। বর্তমানে বহু কলাবিদ্যাব কলেজ স্বাবলম্বী। সুতবাং বাষ্ট্রেব উচিত সরকাবী কলেজ সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া। চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষাব কলেজগুলি উপযুক্ত হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত বাখা উচিত। ধনীদেব নিকট যখন মেডিকেল কলেজগুলি প্রয়োজনীয় তখন নিশ্চয়ই তাহারা চাঁদা তুলিয়া কলেজ-গুলি পবিচালনায় সাহায্য কবিবেন। কৃষি কলেজগুলিকেও স্বাবলম্বী হইয়া নিজেদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ কবিতে হইবে।"

বুনিয়াদী পরিকল্পনায় কেন উচ্চশিক্ষাকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয় নাই সেই সম্পর্কে আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন,—"যাহারা এই বিলাস (উচ্চশিক্ষা) চাহে, তাহাদেরই এই জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। ভাবতেব অশিক্ষিত জনসাধাবণ এই জন্য অর্থ যোগান দিবে ইহা নিশ্চয়ই তাহাদের আশা কবা উচিত নহে।" (The Latest Fad).

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলিতেন। ১৯৩৮ সালের নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের ১৩শ অধিবেশনে একটি প্রেরিত বাণীতে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"যে ভাবে কাগজে কলমে দেখানো হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, প্রকৃত শিক্ষা একমাত্র যাহারা ঐ সম্পর্কে অর্থব্যয় করিতে সক্ষম হইবে তাহারাই পাইবে।...ইহা প্রকৃতই দুঃখের যে আমাদের যে শিক্ষা

পরিকল্পনাটি আদর্শ শিক্ষা পরিকল্পনা বলিয়া পরিচিত, তাহাতেই এরূপ ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ শিক্ষার সামান্য মাত্র উচ্ছিষ্ট পাইবে এবং অধিকাংশ অংশই কেবল বিত্তশালীদের জন্য বরাদ্দ থাকিবে। আমার মনে হয় এই ত্রুটি কেবল মাত্র কাগজেই আছে, কারণ মহাত্মাজীর চেয়ে কে আর দরিদ্র শিশুদের বেশি ভালবাসিতে পারে ?"

অবশ্য কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে রবীন্দ্রনাথের এই অনুমানই ঠিক। ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিবার পর উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য ব্যয় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। মধ্যশিক্ষার উন্নতির জন্য সরকার হইতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হইতেছে। তবে এই সমস্ত শিক্ষার সহিত বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার কোন সংযোগ আনয়নের জন্য তেমন কোন চেষ্টা করা হয় নাই।

তবে ১৯৪৪ সালের সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় দেখা যায় বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত উচ্চশিক্ষার একটি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

বুনিয়াদী পরিকল্পনায় মাতৃভাষার সহিত হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিতে বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করেন। তবে আধুনিক শিক্ষাবিদদের মত এই যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা শিক্ষাদানের চেষ্টা করা উচিত নহে। প্রথম হইতেই অন্যভাষা শিক্ষাদানের চেষ্টা করিলে শিশুর নূতন শব্দ আহরণে ব্যাঘাত হইতে পারে এবং শব্দের প্রকৃত ব্যবহার শিক্ষায় অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইতে পারে। তাহা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর যাহারা উচ্চতর শিক্ষার দিকে যাইবে না তাহাদের পক্ষে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শিক্ষার যৌক্তিকতা কোথায় ?"

বুনিয়াদী শিক্ষাপরিকল্পনাকে এখনও বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার

নানা স্তর অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণতার দিকে যাইতে হইবে। অতিরিক্ত গোড়ামী বশত অনেকে মনে করেন যে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির শেষ কথা বুনিয়াদী পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে এবং ইহা অন্যান্য পরিকল্পনা হইতে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ধারণা করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশে বহু মনীষী এই সম্পর্কে চিন্তা করিয়া নানাবিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের রুশো, পেস্তালৎসী, হার্বার্ট, ফ্রোয়েব্‌ল, মন্তেসরী, ডিউই ও আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক পরিকল্পনার ভিতরেই কিছু কিছু গ্রহণযোগ্য বিষয় নিশ্চয়ই আছে। পাশ্চাত্য দেশে এবং আমাদের দেশেও শিশুশিক্ষা ক্ষেত্রে ফ্রোয়েব্‌ল ও মন্তেসরীর প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুশিক্ষার মত একটি জটিল ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিয়া কোন পদ্ধতি চালু করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বুনিয়াদী পরিকল্পনা লইয়া গবেষণা ও পরীক্ষার প্রয়োজন জাকীর হোসেন কমিটী স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণার ফল আমরা পাই নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এখন পর্যন্ত এই সম্পর্কে গবেষণা একমাত্র সরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে। রাজনৈতিক প্রভাব এই প্রকারের গবেষণাকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিতে চেষ্টা করে ইহা সকলেই জানেন। এই জন্য অনেকে মনে করেন—বিশ্ববিদ্যালয় বা ঐরূপ কোন নিরপেক্ষ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মারফৎ এই প্রসঙ্গে গবেষণা প্রয়োজন।

———

একটি ঐতিহাসিক শিক্ষা-পরিকল্পনা

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর শিক্ষা-পরিকল্পনা: শিক্ষার মূলনীতি, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার বিভিন্ন স্তর, প্রাক্-প্রাথমিক স্তর, প্রাথমিক শিক্ষা, মধ্য-শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, ত্রুটিপূর্ণ ও সমস্যামূলক শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষক সমস্যা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উচ্চ কারিগরী শিক্ষা, অর্থ-সমস্যা

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনায় গান্ধীজীর বুনিয়াদী পরিকল্পনা এবং কেন্দ্রীয় 'শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা সংস্থার' যুদ্ধপরবর্তী শিক্ষা পরিকল্পনা (Report of the Central Advisory Board of Education, 1944), যাহা সার্জেণ্ট স্কীম নামে সাধারণের নিকট পরিচিত, এর গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এই দুইটি পরিকল্পনা ছাড়া অন্য আরও একটি পরিকল্পনা এক সময়ে এদেশের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা বিস্তারের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। উহা রচনা করেন কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর শিক্ষাবিষয়ক সাব-কমিটী। ঐ পরিকল্পনায় দেশের নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের শিক্ষা বিস্তারের যে মনোহর ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা দেশের শিক্ষক ও শিক্ষাবিজ্ঞানীদের নিকট আজও বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করি।

উক্ত ন্যাশনাল প্লানিং কমিটীর সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং উহার বিভিন্ন সাব-কমিটীতে ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের স্থান দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষাবিষয়ক সাব-কমিটীতে ছিলেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ডাঃ জাকীর হোসেন, নন্দলাল বসু, অনাথ নাথ বসু প্রভৃতি শিক্ষাব্রতিগণ। যদিও জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী গঠিত হয় ১৯৩৮ সালে, তথাপি নানা অসুবিধার জন্য ১৯৩৯ সালের পূর্বে কমিটীর পক্ষে কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয় না। মোটামুটিভাবে কমিটী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, সার্বজনীন শিক্ষার বাধা, শিক্ষার মূলনীতি (Basic principles), শিক্ষা পরিকল্পনা (administration) প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন।

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের জন্য ব্যাপক গণশিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জটিল কাজ সন্দেহ নাই। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাগত পার্থক্য, লোকসংখ্যা, আবহাওয়া, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়

বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর শিক্ষা-বিষয়ক সাব-কমিটী উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পনা রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বৃটিশ আমলে শিক্ষা নির্দিষ্ট ছিল ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের জন্য। প্রথম হইতেই এই দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল, এই দেশে বৃটিশের শাসনকার্যে সাহায্য কবিবার জন্য একটি তথাকথিত ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা। এই সম্প্রদায় বরাবর এই দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেব এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিয়াছে। কেরানী সৃষ্টির জন্য নিদিষ্ট যে শিক্ষা তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—ইংরাজী ভাষা লিখন-পঠনে অভ্যস্থ হওয়া। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাই যেন ঐ এক লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালিত হইত। স্কুল কলেজগুলি হইত কারখানার মত, হাজাব হাজার ইংরাজী-জানা লোক সৃষ্টির জন্য—যারা হইত একই ছাঁচে একই প্যাটার্ণে গড়া। প্রকৃত মানুষগড়ার শিক্ষা এইরূপ অক্ষরজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে শিশুমনের সুপ্ত সুপ্রবৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করা। কিন্তু বিদেশী শাসন-ব্যবস্থায় এই সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতা একমাত্র পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভরশীল ছিল।

ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীকে শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার গ্রহণ করিতে হইল।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর মতে কোন রাজনৈতিক দলের দখলে রাষ্ট্রক্ষমতা রাখিবার ষড়যন্ত্রে শিক্ষাকে ব্যবহার করা উচিত নহে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে দেশের জনসাধারণকে গণতন্ত্রের উপযোগী স্বাধীন নাগরিক হিসাবে প্রস্তুত করা এবং একমাত্র এইরূপ শিক্ষার সাহায্যেই জনসাধারণকে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন-পরিকল্পনায় অংশ-গ্রহণ করানো সম্ভব।

জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনাকে নিম্নলিখিত দশটি অংশে বিভক্ত করিয়া পরিকল্পনা কমিটী ঐ সম্পর্কে অভিজ্ঞদের সাহায্য লইয়া মতামত প্রদান করেন। যথা :—

১। জাতীয় শিক্ষা-পবিকল্পনার মূলনীতি নির্ধারণ।

২। জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়।

৩। বিভিন্ন স্তরেব শিক্ষাব অর্থাৎ বুনিয়াদী, মধ্য-শিক্ষা ও উচ্চ-শিক্ষার পদ্ধতি ও পাঠ্যবিষয় নিধাবণ।

৪। বিদ্যালয়েব শিক্ষা সমাপ্তিব পর,—শিক্ষার্থীব সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নেব জন্য অতিবিক্ত ব্যবস্থা।

৫। ত্রুটিপূর্ণ (Defective), পশ্চাৎগামী (Backward) ও সমস্যামূলক (Problem) শিশুদেব শিক্ষার ব্যবস্থা।

৬। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষার অন্যান্য উপকবণেব জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

৭। বিশ্ববিদ্যালযেব শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কারিগরী শিক্ষা ও বিদেশে উচ্চশিক্ষাব ব্যবস্থা।

৮। শিক্ষিত ব্যক্তিদেব কর্মেব সংস্থান।

৯। জাতীয় শিক্ষা-বিস্তাবে বেসরকাবী প্রচেষ্টার সীমা নির্ধাবণ।

১০। শিক্ষাব জন্য যথোপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা কবা।

শিক্ষার মূলনীতি

শিক্ষাব মূলনীতি নির্ধাবণ প্রসঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী মন্তব্য করেন—ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসবেব প্রত্যেকটি বালক-বালিকার জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষার-ব্যবস্থা কবিতে হইবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এইরূপ শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। শিশুকে শুধু বিদ্যালয়ে আনিলেই চলিবে না। শিশু যতদিন না উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত হইবে, ততদিন

তাহাকে বিদ্যালয়ে রাখিতেই হইবে। প্রাদেশিক প্রয়োজনানুসারে পাঠ্যবিষয়ের অবশ্যই কিছু অদলবদল করিবার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার মূলনীতি সর্বত্রই একইভাবে প্রযোজ্য।

পিতামাতা যদি শিশুকে নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রদানে অক্ষম হ'ন, তাহা হইলে রাষ্ট্রকেই সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। দরিদ্র পিতা-মাতাকে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে দেয় মাহিনার দায় হইতে রেহাই দিলেই চলিবে না, শিশুর প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষার অন্যান্য সরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহ করিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার একটি মাত্র নির্দিষ্ট নীতি স্থির করিতে হইবে। কোন কারণেই শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না। এই শিক্ষা হইবে আবশ্যিক। শিশুর যদি শারীরিক ও মানসিক কোন বিষয়ে কোন ত্রুটি থাকে, তবে তাহাকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত না করিয়া উপযুক্ত অন্য কোন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

দেশের প্রত্যেক শিশুকে উপযুক্ত নাগরিকে রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রের পক্ষে এই দায়িত্ব অস্বীকার করা চলিবে না। সুতরাং, প্রাদেশিক, কেন্দ্রীয় প্রত্যেক সরকারকেই প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থাকিবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের বিষাক্ত আবহাওয়া যাহাতে কোনক্রমেই শিক্ষার পবিত্রতা নষ্ট করিতে না পারে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য কোন বিশেষ প্রকারের বিদ্যালয় রাখা চলিবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের জন্য একই প্রকারের সুযোগ রাখিতে হইবে। যদি কোথাও বিশেষ প্রকারের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তবে খুব সতর্কতার সহিত এই বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে।

জনশিক্ষায় বিজ্ঞান ও কলা সম্পর্কে গবেষণার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই কঠোর ও প্রাণশূন্য হওয়া উচিত নহে। সুতরাং শিক্ষাবিদ্‌গণ যাহাতে জন-শিক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত গবেষণা করিতে পারেন তাহার উপযুক্ত সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষার লক্ষ্য

জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—

(১) মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে বিকশিত করিতে সাহায্য করা,—ভবিষ্যতে যাহাতে শিশু রাষ্ট্রের একজন সৎ নাগরিক হিসাবে আপন যোগ্যতা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবা করিতে সক্ষম হয়।

(২) জাতীয় শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, জীবনযুদ্ধের জন্য বিদ্যার্থীকে প্রস্তুত করা, যাহাতে ভবিষ্যতে সে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে।

শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্যগুলি সফল করিতে হইলে কেবলমাত্র শিশুর স্মৃতি-শক্তি-বৃদ্ধি বা বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না, শিশুর শারীরিক ও মানসিক গুণাবলী বিকাশের সুযোগ এরূপভাবে দিতে হইবে, যাহাতে শিশু নিজের শক্তির সাহায্যেই সব কিছু আয়ত্ত করিতে পারে।

এইজন্য শিক্ষা প্রদানের মাধ্যম হইবে শিশুর মাতৃভাষা। শিক্ষাকে শিশুর নিকট আনন্দদায়ক করিতে হইলে,—শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্পের একটি বিশেষ স্থান রাখিতে হইবে। আনন্দের সহিত শিক্ষাকে যুক্ত করিতে পারিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

বৃটিশ শাসন কালে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এদেশের কিছু লোককে লেখাপড়া শিখাইয়া বিদেশী শাসন চালু রাখিতে সাহায্য করা। শিক্ষার মাধ্যম ছিল শাসক-শ্রেণীর ভাষা এবং এই ভাষা ছিল অধিকাংশ দেশ-

বাসীর নিকট অবোধ্য। বিদ্যার্থীর অন্তর্নিহিত গুণাবলী বিকাশের দিকে কিছু মাত্র নজর দেওয়া হইত না। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ভর করিত পরীক্ষা পাশের উপর।

বিদেশী শাসনকালে শিক্ষার যে লক্ষ্য ছিল বর্তমানে তাহার পরিবর্তন প্রয়োজন। সমগ্র জাতির গুণাবলী ও যোগ্যতা বিকাশের ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। শুধুমাত্র শিশুকে বিদ্যালয়ে আনিলেই চলিবে না; শিশুকে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে। এই শিক্ষার লক্ষ্য হইবে শিশুর অন্তর্নিহিত সৎবৃত্তি-গুলি বিকশিত করা।

প্রয়োজন বোধে শিক্ষাকে মানুষের জীবিকার সহিত যুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে শিক্ষার সাংস্কৃতিক মূল্য যেন কোনভাবেই অবেহেলিত না হয়। শিক্ষিত নরনারীর যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থাও শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর রিপোর্টে শিশুর বয়সভেদে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করা হইয়াছে। কমিটীব মতে বিভিন্ন স্তরেব শিক্ষার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। বিশেষ কবিয়া দেশের বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজন অনুযাযী শিক্ষাকে এইরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যেন ভবিষ্যতে দেশে শিক্ষিত বেকারের সৃষ্টি না হয়।

প্রাক্ প্রাথমিক স্তর (Pre-School Stage)

বর্তমান অবস্থায় এই স্তরের শিক্ষাকে অনেকেই বিলাস বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা চলে না। বিশেষ করিয়া যে সমস্ত শিশুর মাতাকে কাজের জন্য বাহিরে

থাকিতে হয়, তাহাদের পক্ষে এই জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য।

জাতীয় পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রাক্-বিদ্যালয় বা প্রাক্-প্রাথমিক স্তবকে প্রাক বুনিয়াদী বা Pre-basic education হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাক্-বুনিয়াদী-শিক্ষা সম্পর্কে কমিটী নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ কবিয়াছেন।

১। শিশুর জীবনে প্রথম হইতেই শিশুব সর্বপ্রকাব দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করাব বহু অসুবিবা আছে, কারণ এইরূপ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত এই সম্পর্কে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যের এবং শিক্ষা-প্রদানেব উপযুক্ত উপকরণের অভাব বহিয়াছে। কিন্তু সর্বপ্রকার অসুবিধা সত্বেও এই স্তবের শিক্ষার বিশেষ প্রযোজন আছে। কমিটীর মতে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনেব প্রথম দশ বৎসরের মধ্যে এই স্তরেব শিক্ষার জন্য একটি ব্যাপক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

২। এই স্তরের শিক্ষাকে আবশ্যিক করা উচিত হইবে না। প্রাথমিক বা বুনিয়াদী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক কবিতে হইবে।

৩। বুনিয়াদী শিক্ষা আবম্ভ করিবার পূর্বের দুই বৎসর প্রাক্-বুনিয়াদী স্তর হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

৪। যেখানে গৃহে শিশুদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে, সেইখানেই সাধারণতঃ পাঁচ হইতে সাত বৎসরের শিশুদের জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন বোধে এই স্তরে শিক্ষার স্থায়িত্ব-কাল তিন বৎসর পর্যন্ত করা যাইতে পারে।

৫। প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(ক) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রাক-বুনিয়াদী বিদ্যালয়েব প্রত্যেকটি শিশুকে উপযুক্ত ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে। শারীরবিদ্যা ও ঔষধপত্র সম্পর্কে শিক্ষকেরও প্রাথমিক জ্ঞান রাখিতে হইবে। শিশুদের ছোটখাট রোগের চিকিৎসা উপযুক্ত ডাক্তারের অভাবে শিক্ষককেই করিতে হইবে।

(গ) নানাভাবে শিশুদেব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবার অভ্যাস, এক সঙ্গে কাজ করিবার অভ্যাস প্রভৃতি সু-অভ্যাস গঠনের প্রযোজন।

(ঘ) বিদ্যালয়ে শিশুদেব খেলাধুলার যথেষ্ট সুযোগ রাখিতে হইবে।

(ঙ) আলাপ-আলোচনা, সঙ্গীত, নৃত্য নাটক-অভিনয় ও নানা প্রকারের হাতের কাজের সাহায্যে শিশুর আত্মবিকাশের সুযোগ দিতে হইবে।

(চ) বিদ্যালয়ে সামাজিক গুণাবলী ঠিকভাবে আয়ত্ত করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে (social education)।

(ছ) প্রকৃতি-বিজ্ঞান, পোষা জীবজন্তুর যত্ন প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষাদান প্রয়োজন।

(জ) শিশুর বোধশক্তি বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। (sensory motor training)

৬। কমিটীর মতে প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রথমে সহর এলাকায় এবং পরে পল্লীতে প্রবর্তন করা উচিত। বিভিন্ন কল-কারখানার কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে উৎসাহী করিতে হইবে। এই সকল বিদ্যালয় সরকারী শিক্ষাদপ্তরের অধীন থাকিবে। পল্লী-অঞ্চলে এই ধরণের

শিক্ষাব জন্য স্থানীয় কমিটী (Local bodies) গঠন করা যাইতে পারে। পল্লী-অঞ্চলে স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উদ্যোগে যাহাতে এইরূপ বিদ্যালয় পবিচালনা করা যাইতে পারে তাহাব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭। প্রাক্-বুনিযাদী বিদ্যালয়েব জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষকদেব শিক্ষা এবং নির্বাচনেব জন্য বাষ্ট্রকেই পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ কবিতে হইবে। সাধাবণতঃ মহিলাদেবই এইরূপ বিদ্যালয়েব শিক্ষকতাব জন্য নির্বাচন কবা উচিত। এই শিক্ষয়িত্রীদেব মধ্য-শিক্ষায় উত্তীর্ণ এবং প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষায় বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে। প্রথম অবস্থায় উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া সম্ভব না হইলে এই কার্যে উৎসাহী বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকদেব নিযুক্ত কবা যাইতে পাবে। কমিটীব মতে গ্রামাঞ্চলে ঐ সকল শিক্ষয়িত্রীদেব মাহিনা অন্ততঃ কুড়ি টাকা এবং সহব অঞ্চলে আবও কিছু বেশী বেতন দেওয়া যাইতে পাবে। এই সকল শিক্ষয়িত্রীদের ইংবাজী জ্ঞানেব কোন প্রয়োজন নাই।

৮। প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালযগুলি পবিদর্শনের জন্য একদল দক্ষ পবিচালকমণ্ডলী থাকা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা বা বুনিয়াদী শিক্ষাব অধিকাব সকল শ্রেণীব শিশুদেব প্রাথমিক অধিকার। প্রত্যেক সভ্যদেশই প্রাথমিক শিক্ষাকে এই নীতিব ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুকে শুধু বিদ্যালয়ে আনিলেই চলিবে না, তাহাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদ্যালয়ে রাখিতেই হইবে। ঐ নির্দিষ্ট সময় এইরূপভাবে স্থির করিতে হইবে, যাহাতে ঐ সময়ের মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা আধুনিক

গণতন্ত্রের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে নিজেদের তৈয়ারি করিয়া লইতে পারে। শিক্ষাই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। শিক্ষা-বিস্তারকে জাতীয় পুনর্গঠনের মূল বনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ না করিলে কোনক্রমেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নহে। গণতন্ত্র যদি দেশের নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা দখলের জন্য ফাঁকা বুলি মাত্র না হয়, যদি দেশের প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পূর্ণ বিকাশের অধিকার রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্যাপক ও বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা শুধু কোনরকমে প্রদান করিলে চলিবে না—প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই শিক্ষার সাহায্যে দেশের প্রত্যেকটি শিশুই যেন পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। বর্তমান ব্যবস্থায় মাত্র সমান্য কয়েক ব্যক্তির ঐ সুযোগ আছে। জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই নীতি পরিবর্তন করিতে হইবে।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী বুনিয়াদী বা প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কে নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য এই শিক্ষাকে অবৈতনিক ও আবশ্যিক করিতে হইবে। যে সমস্ত অঞ্চলে প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয় নাই, সেই সমস্ত অঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষা ছয় বৎসর হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শিশুকে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে।

পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবার পর শিশুকে মধ্য-বিদ্যালয়ে (Intermediate School) ভর্তি হইবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। দারিদ্র্যের জন্য যাহাতে প্রকৃত মেধাবী ছাত্রদের মধ্য-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে বাধা না হয়, তদ্বিষয়ে রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সম্পর্কে মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তির জন্য যথেষ্ট সরকারী অর্থ বরাদ্দ করিতে হইবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিতে হইবে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্গে হিন্দুস্থানী ভাষা আবশ্যিক ভাষা হিসাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

[মন্তব্য ঃ

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর বৈঠকে ডাঃ মেঘনাদ সাহা এই প্রস্তাব পেশ করেন যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষার জন্য লাটিন হরফের প্রবর্তন করা উচিত। অধ্যাপক আর, কে, মুখার্জী এবং ডাঃ মেটা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু অন্যান্যেরা ইহাতে আপত্তি করেন।]

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তবে বেসিক ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াই উচিত। ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে একটি প্রাচীন ভাষা (Classical Language) শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর মতে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পাঁচ বৎসরে শিশুর শিক্ষা একটি শিল্পের মাধ্যমেই হওয়া উচিত। ডাঃ মেঘনাদ সাহা এবং অধ্যাপক আর, কে, মুখার্জী বলেন যে একটি শিল্পকে কেন্দ্র না করিয়া সাধারণ শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে হাতের কাজ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, চিত্রাঙ্কন, উদ্যান নির্মাণ, কৃষির কাজ, মাটির মূর্তি নির্মাণ, কাঠের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া উচিত। অধ্যাপক কে, টি, শা' একটি শিল্পের স্থানে কয়েকটি শিল্প নির্বাচনের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু কমিটী জাকির হোসেন কমিটী কর্তৃক প্রস্তুত সিলেবাসই গ্রহণ করেন।

সম্ভবক্ষেত্রে কমিটী বালক-বালিকাদের জন্য সহশিক্ষার সুপারিশ করেন। কমিটীর মতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য মহিলাদের নির্বাচন করা উচিত। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কোনরূপ ধর্ম শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

পরীক্ষা-গ্রহণ সম্পর্কে কমিটীর অভিমত এই যে, বর্তমানের ন্যায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না। ছাত্রদের পাঠ সম্পর্কে দৈনিক উন্নতির বিবরণ (cumulative record) রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ভার বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষেরই করিতে হইবে।

পঞ্চম বৎসরের শেষে বিদ্যার্থীর যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশেষ শিক্ষার জন্য নির্বাচন করিতে হইবে। সাত বৎসর বুনিয়াদী শিক্ষার শেষে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একখানি যোগ্যতাপত্র (certificate) প্রদান করিবেন। মধ্যবিদ্যালয়সমূহে প্রবেশের যোগ্যতা মধ্যবিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষই স্থির করিবেন।

কমিটীর মতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেরই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান একই প্রকারের হওয়া উচিত। প্রত্যেক অঞ্চলেই বিদ্যালয়-পরিদর্শন এবং শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

কমিটী বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে (types) ভাগ করিয়াছেন। যে-সমস্ত বিদ্যালয়ে সপ্তম মান পর্যন্ত সাতটি বর্গ থাকিবে, তাহাদিগকে বলা হইবে **কেন্দ্রীয় শিক্ষালয়** (Central School) এবং যে-সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রথম চারিটি বর্গ থাকিবে, তাহাদিগকে বলা হইবে **পোষক বিদ্যালয়** (Feeder School)। যে-সমস্ত গ্রামের বা অঞ্চলের লোক সংখ্যা অন্ততঃ ২০০০ হাজার এবং যে অঞ্চলে অন্ততঃ ২০০ ছাত্র পাওয়া সম্ভব, সেই স্থানেই কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় স্থাপন করা যাইতে পারে। স্থানীয় কমিটীর তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের পরিচালনা কার্য চালাইতে হইবে। প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'বুনিয়াদী শিক্ষা বোর্ড' বিদ্যালয় পরিদর্শন, পরিচালনা এবং শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে নীতি স্থির করিবেন।

পোষক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা অন্ততঃ ৪০ হইতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ব্যয় নির্বাহের জন্য

প্রাদেশিক সরকারকে অর্থসাহায্য করিবেন এবং প্রাদেশিক সরকার অর্থ সাহায্য করিবেন স্থানীয় কমিটীকে। প্রয়োজন বোধে স্থানীয় কমিটীরও জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা থাকিবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সম্ভাবনা এবং সুযোগ সম্পর্কে কমিটী কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বিবরণ পরীক্ষা করিয়া কমিটী মত প্রকাশ করেন যে বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহে ছাত্রদের হার যে ভাবে বৃদ্ধি পাইযাছে তাহা সন্তোষ-জনক। এই অবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য বর্তমান ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন আনা যুক্তিসঙ্গত নহে। কমিটীর মতে খুব সতর্কতার সহিত প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা উচিত। এই সম্পর্কে সহর অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে কোনরূপ পরিবর্তন না আনিয়া, গ্রাম অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিই প্রথম সংস্কার করা উচিত। গ্রাম্য বিদ্যালযগুলিতে কৃষিকাযকেই প্রধান শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কমিটীর মতে এই পদ্ধতি প্রথমে গ্রামে সফল হইলে, তবে সহর অঞ্চলে পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

মধ্যশিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষা

(Secondary or Technical Education)

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় মধ্যশিক্ষার সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু এই স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা উচিত নহে। সম্পূর্ণ দায়িত্ব না লইয়াও রাষ্ট্রকে এই শ্রেণীর সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনের এবং পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী শিক্ষা-বিভাগকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে এইরূপ বে-সরকারী বিদ্যালয়ে যেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের লাভের মনোবৃত্তি প্রশ্রয় না পায়। শিক্ষার মান নির্ধারণ,

পরিচালনার নীতি স্থির করা,—শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নিরূপণের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকিবে। এই স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক করা সম্ভব হইবে না; এই কারণে উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রদের জন্য এই স্তরে প্রচুর সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বয়স্ক-শিক্ষা

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী বয়স্ক-শিক্ষা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পৃথক সাব-কমিটী গঠন করেন। উক্ত সাব-কমিটীর রিপোর্ট পরিকল্পনা কমিটী পুরাপুরি গ্রহণ করেন। বয়স্ক শিক্ষা-কমিটীর সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখিয়া দেশে গণতন্ত্র চালু করিবার স্বপ্ন বাতুলতা মাত্র। সুতরাং জাতীয় সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হইল বয়স্ক-শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা। প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের হইলেও বয়স্ক-শিক্ষার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ যাহারা কোন বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পায় নাই কিংবা যাহারা লেখাপড়া শিখিবার সামান্য মাত্র সুযোগ পাইয়াছে তাহাদের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নাগরিক জীবনের কর্তব্যবোধ শিক্ষা দেওয়াও বয়স্ক-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। এইরূপ শিক্ষার সাহায্যেই দেশবাসীকে উদারদৃষ্টি সম্পন্ন দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত করা যাইতে পারে।

বয়স্ক-শিক্ষার সমস্যা অত্যন্ত জটিল। সেই কারণে খুব সতর্কতার সহিত এই ব্যাপারে কার্য আরম্ভ করিতে হইবে। কমিটীর মতে বর্তমানে আঠার হইতে পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত ব্যক্তিদের জন্যই বয়স্ক-

শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। পরে ধীরে ধীরে অন্যান্যদের জন্যও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হইবে। কমিটী মনে করেন যে বর্তমানে বয়স্ক-শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে সমস্ত ব্যক্তি বিদ্যালয়ে কোন দিন পড়িবার সুযোগ পায় নাই এবং যাহাদের কোনরূপ অক্ষর পরিচয় নাই, তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় নির্দিষ্ট থাকিবে তাহাদের জন্য যাহারা কিছু লেখাপড়া জানে এবং যাহারা নানা কারণে প্রাথমিক শিক্ষার নির্দিষ্ট পাঠ সমাপ্ত করিতে পারে নাই। উভয় প্রকারের বিদ্যালয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকিবে না। শুধু প্রথমোক্ত বিদ্যালয়-গুলিতে অক্ষর পরিচয় হইতে শিক্ষা আরম্ভ করা হইবে। কমিটী মনে করেন লিখিতে-পড়িতে শিক্ষাদান করাই এই বিদ্যালয়ের প্রধান কার্য। যেমন করিয়াই হউক ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ অক্ষর পরিচয়হীন জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই কাজ একটু দ্রুততার সহিত করাই প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা সম্পন্ন করিতে চার বৎসর লাগিবে, বয়স্কদের বিদ্যালয়ে তাহাই সম্পন্ন করিতে হইবে এক বৎসরে। এই এক বৎসরের মধ্যে আঠার বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত যাহাদের বয়স, তাহাদিগকে মাতৃভাষায় লিখিতে পড়িতে জানা এবং সামান্য হিসাব রাখা শিক্ষা দিতে হইবে।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য লেখা, পড়া এবং গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান পাঠ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করিতে হইবে। এই সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে পাঠ্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, বয়স্কদের পাঠ্য বিষয় হইবে উহা হইতে স্বতন্ত্র। কারণ বয়স্কদের

রুচি এবং শিশুদের রুচির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ ধরণের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিতে হইবে। পাঠ্য তালিকায় দৈনন্দিন সাংসারিক হিসাব-নিকাশের জ্ঞান, প্রাথমিক ইতিহাস ও ভূগোল, আন্তর্জাতিক ঘটনা-সমূহের আলোচনা, সাধারণ বিজ্ঞান, এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে বিজ্ঞানের স্থান, ব্যক্তিগত এবং সমাজগত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, কিছু হাতের কাজ এবং বয়স্কদের উপযোগী খেলা-ধুলার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করিতে হইবে বয়স্কদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া। ক্লাশে নিয়মিত পড়ানো ছাড়া বক্তৃতা ও আলোচনার সাহায্যেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

বয়স্ক-শিক্ষা-পরিকল্পনায় বয়স্ক স্ত্রীলোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করাও একটি বিশেষ সমস্যার বিষয়। কিন্তু বিষয়টি খুব সমস্যাপূর্ণ হইলেও এই বিষয়ে অবহেলা করা চলিবে না। কমিটীর মতে বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক নিযুক্ত না করিয়া যদি দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করা যায় এবং ঐ দুইজন যদি স্বামী-স্ত্রী হন, তবে সমস্যার কিছু সমাধান হইতে পারে। পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় ছাড়াও স্ত্রীলোকদের জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয়, যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, মাতৃত্ববিষয়ক জ্ঞান, এবং শিশু-পালন-সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান, পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকেই বয়স্ক-শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়িতে হইবে। বয়স্ক-শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত একটি গ্রন্থাগার এবং পাঠকেন্দ্র যুক্ত রাখিতে হইবে। শিক্ষকদের কার্যের ফলাফলের ভিত্তিতে উঁহাদের বেতন স্থির করিতে হইবে। উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনার জন্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে। বয়স্ক বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষক ছাড়া

একদল ভ্রাম্যমান শিক্ষক নিযুক্ত করা যাইতে পারে ; ইহাদের কাজ হইবে বয়স্কদের নিকট দেশের প্রধান সমস্যাগুলি লইয়া আলোচনা করা।

নানা উপায়ে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশেষ ধরণের বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতির সাহায্যে বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকতা কার্যের জন্য স্থানীয় শিক্ষকদের সাহায্য লইতে হইবে এবং সুবিধা অনুযায়ী স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেখানেই সম্ভব সেইখানেই স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তি-বর্গের সাহায্য এই ব্যাপারে গ্রহণ করিতে হইবে। ছাত্রদের এই কার্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে গ্রীষ্মের ও শরতের দীর্ঘ অবকাশের সময়। তবে বয়স্ক শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষা (ট্রেনিং) গ্রহণ করিতে হইবে।

বয়স্ক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ বোর্ডে বয়স্ক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বিভাগের প্রতিনিধি রাখিতে হইবে। ঐ বোর্ডের কাজ হইবে বয়স্ক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা ও ম্যাপ, চার্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করা, নির্দিষ্ট এলাকায় বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে উৎসাহী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বয়স্ক-শিক্ষা সম্পর্কে রিসার্চের ব্যবস্থা করা, বাৎসরিক অধিবেশনের আয়োজন করা এবং বিভিন্ন বেসরকারী ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করা। সরকারী সাহায্যের মারফৎ বয়স্ক শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে।

ত্রুটীপূর্ণ ও সমস্যামূলক শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটী এই অভিমত পোষণ করেন যে, যে-সমস্ত শিশুর শিক্ষাদান সাধারণ বিদ্যালয়ে সম্ভবপর নহে, তাহাদের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ ব্যবস্থা

করিতে হইবে। দেশের ত্রুটিপূর্ণ এবং অপরাধ-প্রবণ শিশুদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব না হইলে উহারা দেশের বোঝা স্বরূপ হইয়া থাকিবে।

শিক্ষক সমস্যা

আবশ্যিক এবং অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের পক্ষে প্রয়োজন একদল উপযুক্ত দক্ষ শিক্ষকের। উপযুক্ত শিক্ষক না পাইলে শিক্ষা সম্পর্কে কোন ব্যাপক পরিকল্পনাই সম্ভব নহে। ১৯৩১ সালের লোকগণনার হিসাব হইতে কমিটী দেখাইয়াছেন যে বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য উপযুক্ত সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের সংখ্যা হইবে প্রায় ৫ কোটী। ১৯৩১ সালের হিসাবে ভারতবর্ষে শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ৩,৪৪,০০০ হাজার। যদি প্রতি ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক ধরা হয়, তবে আমাদের প্রয়োজন ২০ লক্ষ শিক্ষকের। কমিটীর মতে ৭০০টি শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া, এবং প্রতি কেন্দ্রে প্রায় ৫০০ জন শিক্ষকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, আগামী দশ বৎসরে এই অভাব মিটাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত হিসাব শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। মধ্য ও উচ্চশিক্ষার জন্য আরও বহু শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে।

উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষক হিসাবে নির্বাচন করিতে হইবে। উপযুক্ত প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রেরা যাহাতে শিক্ষকতাকে জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য শিক্ষকদের বেতনের হার উন্নত করিতে হইবে। শিক্ষকদের চাকুরীর বর্তমান অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। ইহার পরিবর্তন আবশ্যক। শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে যদি সন্তোষজনক করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু প্রতিভা-

শালী ছাত্র এই বৃত্তি গ্রহণে উৎসাহী হইবে এবং যথেষ্ট যোগ্য শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হইবে। শিক্ষদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা করা এবং সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাকে একমাত্র সমস্যা মনে করিলে ভুল করা হইবে। বর্তমান সময়ে প্রধান সমস্যা হইতেছে—শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে নির্বাচন করা এবং উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের আয়োজন কবা। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ে এইরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন যাহাতে উৎসাহ ও আনন্দের সহিত শিক্ষা-দান সম্ভব হয় এবং শিক্ষকেরা যেন 'ফসিলে' পরিণত না হন। কমিটী এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'শিক্ষা-আইনের' ভিতর শিক্ষকদের অধিকার রক্ষাব জন্য একটি সনদ রচনার প্রয়োজন। এই সনদে শিক্ষকদের নিম্নলিখিত অধিকাব রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

১। জীবন-ধারণের মান অনুযায়ী উপযুক্ত বেতন পাইবার অধিকার।

২। চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্প্রর্কে প্রতিশ্রুতি।

৩। মত প্রকাশের ও সমিতি গড়িবার অধিকার।

৪। উচ্চশিক্ষা ও দেশভ্রমণের সাহায্যে শিক্ষকদের উন্নত হইবার উপযুক্ত সুযোগ।

৫। চাকুরীতে অবসর গ্রহণের পর পেনশন এবং প্রভিডেন্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উচ্চ কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা (University Education, Scientific research and Advanced Technical Training)

বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করিলে, শিক্ষকে

প্রথম হইতেই সাধারণ শিক্ষার সহিত একটি শিল্প শিক্ষা করিতে হইবে। সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্পশিক্ষাব ব্যবস্থা পাশাপাশি চলিতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষাব ক্ষেত্রে নানাবিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

উচ্চশিক্ষাব ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ কবিতে হইলে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে দেশের বিভিন্ন শিল্প ও বৃত্তিব প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বাখিতে হইবে। বর্তমানে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি সুযোগেব অভাবে নিজেদের শিক্ষার সদ্ব্যবহাব কবিতে পারে না। সুতবাং শিক্ষাব সহিত কাজের ব্যবস্থ না করিলে শিক্ষার অপব্যয়েব আশঙ্কা থাকে। বর্তমানে ইন্‌জিনিয়াবিং এবং উচ্চতব বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য বহু যুবককে বিদেশে পাঠানে' হয়। কিন্তু সকল সময়ে ইহাদেব প্রত্যেককে কাজ দেওযা সম্ভব হয় না। সুতরাং দেশেব শিল্প পবিকল্পনাব সহিত শিক্ষা পরিকল্পনাব যোগাযোগ বাখার প্রয়োজন আছে।

বর্তমানে ভাবতবর্ষেব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পবীক্ষা-গ্রহণেব যন্ত্র মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পবিচালনায় যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। ইহার পবিবর্তন আবশ্যক। অন্যথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দলগত রাজনীতিব কেন্দ্র হইবে।

উচ্চশিক্ষা ছাড়া জাতীয় পবিকল্পনা কমিটী উচ্চতম যান্ত্রিক শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা কবেন।

যান্ত্রিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনাব জন্য একটি সাব-কমিটী নিযুক্ত করা হয়। সাব-কমিটীব রিপোর্ট এই স্থানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল।

সাব-কমিটীর মতে জাতীয় পবিকল্পনায় প্রত্যেকটি বিষয় পরস্পরের সহিত যুক্ত থাকা উচিত। তাহা না হইলে বিভিন্ন সাব-কমিটী স্ব-স্ব পরিকল্পনা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বিবরণ পেশ করিতে পারেন।

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক (objective) হওয়া উচিত এবং দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরী শিক্ষাকে মধ্য-শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে। আমাদের জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং শিক্ষার প্রথম হইতেই শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

তবে বুনিয়াদী শিক্ষা বা ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় এমন কয়েকটি বিষয় আছে যাহার পরিবর্তন প্রয়োজন। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া শিক্ষাদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। যে কোনরূপ ব্যাপক শিল্পপরিকল্পনার ইহা বিরোধী। বুনিয়াদী পরিকল্পনায় শিশুকে জীবনের প্রথম থেকেই একটি শিল্পকে শিক্ষার প্রধান বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। শিক্ষার এই শিল্পকেন্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিলে শিক্ষার অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় (যথা,—গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি) যথোপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

কমিটী লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রথমে এই প্রণালী অনুসরণ করা হইয়াছিল। কোন একটি শিল্পের মাধ্যমে ঐ দেশে রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, গণিত ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেবার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই প্রণালীতে শিক্ষার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না। এখন বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেবার জন্য নানা প্রণালী অবলম্বন করা হইতেছে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে শিক্ষাকে

স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, অর্থাৎ এই পরিকল্পনায় এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে যে শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে। জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক কে, টি, শা, ইহাকে 'Exchange motive' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কমিটীর মতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার অন্যতম ত্রুটি এই যে, ইহাতে 'বীজগণিত' শিক্ষা প্রদানের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। বর্তমানে প্রত্যেক দেশেই পাটীগণিত এবং বীজগণিত একই সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাটীগণিতের বহু সমস্যামূলক অঙ্ক (problems) বীজগণিতের সাহায্যে সহজেই সমাধান করা যায়। সুতরাং কমিটীর মতে বীজগণিতকেও বুনিয়াদী পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

কমিটী পাটীগণিতের অন্য একটি মূল বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে দৈর্ঘ্য, ওজন ও মুদ্রা সম্পর্কীয় দেশীয় ও বিদেশীয় এককাবলী শিক্ষা করিতে হয়। এইজন্য ছাত্রদের বহু সময় ব্যয় হয়। কমিটীর মতে ইহার পরিবর্তে যদি ভারতবর্ষে দশমিক প্রণালী ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ছাত্রদের শ্রম বহুল পরিমাণে লাঘব হয় এবং দেশেরও প্রকৃত উপকার হয়।

কমিটীর মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কারিগরীশিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন হাতের কাজ, অঙ্কন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর বৃত্তি-শিক্ষা দেওয়া উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অবশ্য কোন স্তরেই শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করা উচিত নহে। শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয় করা হয়, তাহা আপাত লাভ-লোকসানের দিক হইতে চিন্তা

না করিয়া, ভবিষ্যৎ জাতীয় লাভের দিক হইতেই চিন্তা করা উচিত। এই দিক হইতে বিষয়টিকে দেখিলে, শিক্ষার কোন স্তরকেই অবহেলা করা উচিত নহে।

কমিটীর মতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর অর্থাৎ ১৩।১৪ বৎসর হইতে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষ শিল্পে স্বাবলম্বী না হইলে কারিগরী শিক্ষাকে ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নহে। বর্তমানে কৃষি ও কুটীর শিল্পই ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জন লোকের জীবিকার উপায়। সুতরাং কৃষি ও কুটীর শিল্পের উন্নতিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত না হইলে, দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব নহে।

কারিগরী শিক্ষাকে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যবহার করিতে হইলে, বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আয়ের বিশেষ তারতম্য থাকা উচিত নহে। ইহা হইলে ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে নিজেদের রুচি এবং যোগ্যতা অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করিতে সক্ষম হইবে। বর্তমানে বৃত্তি নির্বাচনে ভবিষ্যৎ আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী ছাত্রেরা বৃত্তি নির্বাচন করিতে পারে না। ইহার ফলে শিক্ষার অপচয় হয়। বর্তমানে একই বিভাগে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও একজন সাধারণ কর্মীর বেতনের অনুপাত ১০০ : ১, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উহার বেশীও দৃষ্ট হয়। সুতরাং বর্তমান অর্থনৈতিক অসাম্যের পরিবর্তন না হইলে, উপযুক্ত লোকদের কর্মে নিযুক্ত করা সম্ভব নহে। কমিটীর মতে শিল্পবিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষারও সুযোগ রাখিতে হইবে।

শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের কোন বৃহৎ কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে হাতেকলমে কাজ শিখিবার সুযোগ দিতে হইবে। বর্তমানে দেশের প্রধান শিল্পগুলি মুষ্টিমেয় কয়েক জন শিল্পপতির হাতে।

কারগরী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইলে, দেশের বৃহৎ শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে আনিতে হইবে।

কমিটীর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের সঙ্গে বিভিন্ন কারখানার ইন্‌জিনিয়ারদের যোগাযোগ থাকা উচিত। কারণ বর্তমানে কল-কারখানায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের ধারণা নিচু থাকে। Bernal তাঁহার "The Social Function of Science" নামক পুস্তকে এইভাবে "Intellectual Snobbery" বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সহিত কারখানার ইন্‌জিনিয়ারদের ব্যবহারিক জ্ঞানের মিশ্রণ ঘটিলে এইরূপ মনোভাবের পরিবর্তন হইবে।

অর্থসমস্যা

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী অর্থ সংগ্রহের জন্যও ব্যাপকভাবে চিন্তা করিয়াছেন। প্রত্যেকটি পরিকল্পনার প্রধান সমস্যা হইল অর্থের সংস্থান করা। ১৯৩১ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় হয় ৩১'৬২ কোটি টাকা। ইহার অর্থ এই যে, বৃটিশভারতের লোক সংখ্যা অনুযায়ী মাথাপিছু শিক্ষার ব্যয় হয় ১২ আনা মাত্র। কিন্তু দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক শিক্ষা হিসাবে প্রবর্তন করিতে হইলে আমাদের প্রয়োজন ৩০০ কোটি টাকার। কাজ আরম্ভ করিবার প্রথম দিকের খরচ হইবে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। কমিটীর মতে যে কোন উপায়েই এই অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে।

এই অর্থ সংগ্রহের জন্য ধনীদের উপর শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত কর ধার্য করিতে হইবে। তবে ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করিলে এই উপায়ে অধিক অর্থ সংগ্রহ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য রাষ্ট্র-পরিচালিত লাভজনক শিল্পের মারফৎ এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

কমিটী শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আরও নানা উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অল্পসুদে অথবা বিনাসুদে জনসাধারণের নিকট হইতে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। দেশে বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে। উহা জনসাধারণের সম্পত্তি, কারণ উহা জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। জন-সাধারণের সমর্থন পাইলে ঐ অর্থ সাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যাইতে পারে। কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা প্রস্তুত জিনিষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় অর্থের একটি অংশ পাওয়া যাইতে পারে। সমগ্র দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য আনুমানিক মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রস্তুত দ্রব্য হইতে প্রায় ১০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইহা সমগ্র প্রয়োজনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। কমিটীর মতে এই সামান্য অর্থের জন্য বিদ্যালয়ের পবিত্র আবহাওয়ায় লাভের মনোবৃত্তি প্রবেশ করানো যুক্তিযুক্ত নহে।

কমিটী কর্তৃক রচিত একটি সামগ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনার চিত্র দেওয়া হইল। (পৃষ্ঠা ৮৪ দ্রষ্টব্য।)

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর শিক্ষা-পরিকল্পনার চিত্র

শিশু

|

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়

(শিশুর বয়স ৫ হইতে ৭ বৎসর)

|

প্রাথমিক বিদ্যালয়

[অবৈতনিক ও আবশ্যিক। শিশুর বয়স ৭ হইতে ১৪।১৫ বৎসর। **পাঠ্য বিষয়ঃ** ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী, কিন্তু হাতের কাজের স্থান গৌণ। বীজগণিত, পাটিগণিতের দেশীয় এককাবলী (বৈদেশিক এককাবলী বাদ দিতে হইবে)। দেশীয় এককাবলী দশমিকের নিয়মে পরিবর্তিত করিতে হইবে। মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইবে।]

কারিগরী বিদ্যালয়

[অবৈতনিক ও আবশ্যিক, শিক্ষাব কাল ঃ ৩-৫ বৎসব]

মধ্য-বিদ্যালয়

[প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিভা-] সম্পন্ন ছাত্রদেব বিনাবেতনে পড়িবাব সুযোগ থাকিবে। শিক্ষাব কাল ৩-৪ বৎসব

শিক্ষা শিক্ষণালয়	**আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র ও অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষা**	**ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষা**	**বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা**
শিক্ষার কাল	শিক্ষাব কাল	শিক্ষাব কাল	শিক্ষাব কাল
২-৩ বৎসব	৩-৫ বৎসব	৪ বৎসব	৩-৪ বৎসব

ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯১৯) বঙ্গীয় (গ্রামাঞ্চলের জন্য) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৩০), সদস্য, প্রাথমিক শিক্ষা কর, কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা সংস্থা,

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে ইহা এক অভিনব পরীক্ষা সন্দেহ নাই। কারণ পৃথিবীর কোথায়ও এইরূপ অধিক সংখ্যক প্রাপ্তবয়স্কদের মতামতের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠনের চেষ্টা হয় নাই। গণতন্ত্রের এই কঠিন পরীক্ষায় ভারতবর্ষকে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, অবিলম্বে দেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার প্রয়োজন। ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র প্রবর্তন করা সম্ভব নহে। এই জন্য যেমন প্রয়োজন দেশের উপযুক্ত বয়সের বালক-বালিকাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, তেমনি প্রয়োজন বয়স্কদের জন্য বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থা।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রায় ১০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু অর্থাভাব ও অন্যান্য কারণে আমাদের পক্ষে এখনও সকল শ্রেণীর বালক-বালিকাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয় নাই। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন রাজ্য গভর্ণমেণ্ট বিধিভুক্ত কোন কোন আইনের সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন, ঐ সম্পর্কে আমাদের আলোচনা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যে বর্তমানে যে আইনের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হইতেছে তাহা বৃটিশ আমলের সৃষ্টি। ঐ সকল আইনের ব্যবস্থা ও সুযোগ একেবারেই বর্তমান স্বাধীন ভারতের প্রয়োজনানুরূপ নহে এবং থাকিতেও পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ সকল আইনের সংস্কারের জন্য কোনরূপ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা আজও আরম্ভ হয় নাই।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সুবিধার বিষয় উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমেই ঐ সকল আইনের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে

সাধারণভাবে আলোচনা প্রয়োজন। এই সময়ে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলি প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে আইনসভাসমূহে আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডেও কিছু কিছু শিক্ষাসংস্কার সাধিত হয় এবং ইংলণ্ডের ১৯১৮ সালের শিক্ষা আইনও ঐ মহাযুদ্ধেব পরে ইংলণ্ডে প্রথম শিক্ষাসংস্কারের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলিও ঐ সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল এইরূপ অনেকে মনে করেন। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯১০ সালে ভারতীয় আইন সভায় যখন মহামতি গোখেলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য একটি বিল আনয়ন করেন, তখন আইন সভাব অধিকাংশ সভ্যদের বিরুদ্ধতার ফলে উহা কার্যে পবিণত হইতে পাবে নাই।

ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলি আলোচনা কবিতে হইলে উহা তদানীন্তন ঐতিহাসিক অবস্থার পবিপ্রেক্ষিতে আলোচনা প্রয়োজন।

১৯১৭ সালেব আগষ্ট মাসে ভারত সচিব (The Secretary of State for India) ভারতীয় নূতন শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে কমন্‌স্ সভায় একটি ঘোষণা পাঠ কবেন। উহাতে বলা হয় যে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে বৃটিশ রাষ্ট্র সংঘের মাঝে একটি স্বায়ত্ব শাসিত দেশ হিসাবে পরিগণিত হইবে।

১৯১৭ সালে ভারত সচিবের ঘোষণার পর, প্রাদেশিক শাসন পরিষদের সরকারী ও বেসরকারী সভ্যগণ দেশে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ১৯১৯ সালে ইংলণ্ডের উভয় সভাতে ভারত শাসন আইন পাশ হইল এবং ঐ আইন অনুযায়ী পরিবর্তিত শাসন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত

সরকার ১৯১৮ সাল হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত নানারূপ সংস্কারমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত হইলেন ঐ ভারত শাসন আইনকে সুষ্ঠুভাবে প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে। এই সময়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিও ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করিলেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপব স্ব স্ব এলাকায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা অর্পণ কবিয়া কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। অবশ্য ঐ আইনগুলি বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপ নিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষমতা অর্পণ করিল। কোথায়ও আইনটি সমগ্র প্রদেশের জন্য পাশ করা হইল। কোথায়ও ইহা হইল শুধুমাত্র মিউনিসিপ্যাল এলাকার জন্য। কোন আইনে বালক-বালিকা উভয়েব জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা বহিল এবং কোথায়ও উহা পাশ করা হইল কেবলমাত্র বালকদের জন্য।

এই প্রবন্ধে ভারতের সকল প্রদেশেব প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলি ব্যাপকভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে, এই জন্য আমরা এই প্রবন্ধে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনগুলি সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিতেছি।

যে দুইটি আইনের সাহায্যে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হইতেছে তাহার আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন

[Bengal Act No IV of 1919]

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯১৯ সালে বিধিবদ্ধ হয়। ঐ আইনে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

ইহা স্থির হইল যে প্রথম অবস্থায় আইনটি বাংলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহে প্রচলিত হইবে এবং পরে বাংলা সরকার

আইনটিকে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন (১৮৮৫) অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়নসমূহেও প্রয়োগ করিতে পারিবেন। আইনটি প্রবর্তিত হইবার এক বৎসর পরে অথবা সরকার কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃপক্ষ নিজ অঞ্চলের শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় তথ্যের একটি বিবরণ সংগ্রহ করিবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের একটি বিশদ বিবরণ সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(১) ছয় হইতে দশ বৎসরের বালক-বালিকাদের সংখ্যা।

(২) অঞ্চলস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাদানের ক্ষমতা, শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং ছাত্রছাত্রীদের দৈনিক উপস্থিতির বিবরণ।

(৩) ছয় হইতে দশ বৎসরের শিশুদের সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষক সংখ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিবরণ।

(৪) শিক্ষা খাতে মিউনিসিপ্যালিটীর বর্তমান ব্যয়ের পরিমাণ এবং সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থের হিসাব।

(৫) শিক্ষাকর খাতে মিউনিসিপ্যালিটীর বর্তমান আয় এবং ভবিষ্যতে শিক্ষাকর ধার্য করা হইলে সম্ভাব্য আয়।

(৬) মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ মিউনিসিপ্যালিটীর সমগ্র অঞ্চলে কিংবা মিউনিসিপ্যালিটীর অংশবিশেষে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ সরকারী অনুদান (grant) বা সাহায্য প্রয়োজনীয় মনে করেন।

উপরোক্ত বিবরণের ভিত্তিতে সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী যদি কমিশনারগণ ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা মিউনিসিপ্যালিটীর সমগ্র অংশে অথবা অংশবিশেষে আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত করেন তবে তাহারা ঐ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশের জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিবেন।

ঐ সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ পাওয়া গেলে, ঐ অঞ্চলের কেবলমাত্র বালকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে।

সরকারের সম্মতিক্রমে মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ 'স্কুল কমিটী' গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করিবেন। উহাতে উহার সভ্যসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হইবে, এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপযুক্ত বয়সের বালকদের বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক উপস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় বিধিও উহার সহিত যুক্ত হইবে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণতঃ **অবৈতনিক হইবে না।** কিন্তু যে অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তন করা হইবে, সেই অঞ্চলের কোন অভিভাবক যদি 'স্কুল কমিটী'কে উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে বুঝাইতে পারেন যে তিনি তাহার পুত্রের বা অধীনস্থ বালকদের বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য সমগ্র বেতন বা উহার কোন অংশ প্রদানে অক্ষম, তাহা হইলে উক্ত বালককে কোন অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হইবে এবং উহাকে 'স্কুল কমিটী'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিনা বেতনে বা আংশিক বেতনে পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

১৯১৯ সালের বঙ্গদেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনের 'শিক্ষা কর' সম্পর্কে নিম্নলিখিত অংশটিও অন্তর্ভুক্ত করা হইল। যদি মিউনিসি-প্যালিটীর বর্তমান আয় সরকারী অনুদান সহ উক্ত অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হয় তবে কমিশনারগণ ঐ অঞ্চলে 'শিক্ষা কর' বসাইবার জন্য সরকারী আদেশের জন্য প্রার্থনা করিবেন। সরকারী আদেশ প্রাপ্ত হইবার পর মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃপক্ষ ঐ অঞ্চলে একটি অতিরিক্ত কর বসাইতে পারিবেন এবং উহা 'শিক্ষা কর' নামে অভিহিত হইবে। ঐ শিক্ষা করের পরিমাণ সম্পর্কে এইরূপ নিয়ম করা হইল যে

মিউনিসিপ্যালিটী শিক্ষা খাতে তাহার নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ অর্থের সহিত সরকারী অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ যোগ করিয়া শিক্ষা ব্যাপারে তাহাদের প্রয়োজনীয় মোট অর্থ হইতে বাদ দিবেন এবং প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থের উপর শতকরা দশ ভাগ অধিক যোগ করিয়া মোট করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন। এই অতিরিক্ত শতকরা দশভাগ যোগ করিবার কারণ সম্পর্কে বলা হইল যে উহার প্রয়োজন হইবে কর আদায়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং অনাদায়ী কর সম্পর্কে ক্ষতি মিটাইবার জন্য। মিউনিসিপ্যালিটীর বরাদ্দ অর্থের মধ্যে ছাত্রদের দেয় বেতন এবং অন্য কোন সূত্রে দান বা চাঁদাও ধরিতে হইবে।

উপরে সংক্ষেপে বঙ্গদেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইনের (১৯১৯) প্রধান প্রধান অংশগুলি উল্লেখ করা হইল। এই আইনের উদ্দেশ্য হইল ১৮৮৫ সালের (Bengal Act No. III of 1885) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিধি অনুযায়ী গঠিত মিউনিসিপ্যালিটী এবং ইউনিয়ন সমূহের অন্তর্গত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা। ১৯১৯ সালে গ্রাম অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল। উহার নাম হইল ১৯১৯ সালের পল্লী স্বায়ত্বশাসন বা Bengal Act No 5 of 1919 ; ইহার দুই বৎসর পরে ১৯২১ সালে, ১৯১৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি পরিবর্তিত হইল এবং এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হইল বঙ্গদেশীয় গ্রাম স্বায়ত্বশাসন আইন অনুযায়ী গঠিত ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে মিউনিসিপ্যালিটীর সমান ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা। এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসমূহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে পারিবে। তবে এই নীতি সর্বক্ষেত্রেই সরকারী অভিমত অনুযায়ী জেলাবোর্ড ও লোকাল-বোর্ড সমূহের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯১৯ সালে বিধিবদ্ধ হইলেও ইহার সাহায্যে বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি করা, অথবা শিক্ষাক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হইল না। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটী এবং কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত অন্য কোথায়ও এই আইনের সুযোগ গ্রহণ করা হইল না। ইহার কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে শিক্ষা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের ভার মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের উপর প্রদত্ত হওয়ায় এই সম্পর্কে কর স্থাপন করিতে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ রাজি হইলেন না। কারণ ক্ষমতার অধিকারী হইবার জন্য তাহাদের জন-সাধারণের ভোটের উপর নির্ভর করিতে হইত। ইহা ছাড়া ১৯১৯ সালের শিক্ষা আইনে এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না যাহার সাহায্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে (Local Bodies) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসংগ্রহের জন্য বাধ্য করানো যাইতে পারে।

১৮৮৪ ও ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন এবং ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থব্যয়ে ক্ষমতা প্রদত্ত হইলেও উক্ত আইন-গুলিতে এইরূপ কোন ধারা ছিল না যাহার সাহায্যে উহাদিগকে স্ব স্ব অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবর্তনে বাধ্য করানো যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে এইরূপ একটি ধারা যুক্ত ছিল যে কলিকাতা কর্পোরেশনকে কলিকাতায় বসবাসকারী ছয় হইতে বার বৎসর বয়স্ক ছেলেদের এবং ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য প্রতি বৎসর ১ লক্ষ টাকা বা তাহার অধিক ব্যয় করিতে হইবে। কিন্তু কর্পোরেশনকে উপযুক্ত বয়সের সমস্ত বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইতে বাধ্য করাইবার মত কোন ব্যবস্থা ঐ আইনে

ছিল না। এই সম্পর্কে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য প্রশংসনীয় ছিল। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটী নিজ এলাকায় বালিকাদের জন্যও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাদের সুবিধার জন্য ১৯৩২ সালের ও ১৯১৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনটিতে কিছু পরিবর্তন করা হয় যাহাতে উহার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা বালিকাদের ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ১৯১৯ ও ১৯২১ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনে মিউনিসিপ্যালিটী এবং ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পিত হইলেও উক্ত কর্তৃপক্ষ নানা কারণে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সক্ষম হইলেন না। ইহার কারণ স্বরূপ আমরা বলিয়াছি যে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হইতেন এবং কর্তৃত্বলোপের ভয়ে তাহারা দরিদ্র জনসাধারণের উপর নূতন কর-ভার চাপাইতে আপত্তি করিলেন। অধিকন্তু পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল (এখনও অবশ্য এই অবস্থার উন্নতি হয় নাই)। অভিভাবকেরা ছেলে-মেয়েদের বাড়ীর ও চাষবাসের কাজে নানাভাবে নিয়োগ করিতেন। ইহাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া অভিভাবকেরা নিজেদের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে রাজি ছিলেন না। বিশেষ করিয়া উক্ত আইন সমূহে প্রাথমিক শিক্ষকে অবৈতনিক করা হয় নাই। বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের না পাঠাইবার ইহাও অন্যতম কারণ বটে। ইহা ছাড়া শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে জনসাধারণের তেমন ধারণা ছিল না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ ছিল না। বৃটিশ আমলের বিদেশী ভাবধারায় শিক্ষিত চাকুরীজীবী বাবুরা জনসাধারণকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহিত

মিশিবার সুযোগের অভাবেও দেশের চাষী-মজুরেরা শিক্ষার তেমন প্রয়োজন অনুভব করিত না।

বালক-বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য বাধ্য করিবার ব্যবস্থা উক্ত আইনে থাকিলেও বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন প্রদানের জন্য অর্থসংগ্রহের কোনরূপ ব্যবস্থা ঐ আইনে না থাকায় নূতন একটি প্রাথমিক শিক্ষা আইনের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ১৯৩০ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে নূতন প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি আলোচনার জন্য বঙ্গীয় আইন সভায় উপস্থিত করা হইল। আইনটি সাধারণতঃ বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে গৃহীত হইল। নিম্নে আইনটির প্রধান ধারাগুলি আলোচিত হইল।

১৯৩০ সালের বঙ্গীয় (গ্রাম অঞ্চলের জন্য) প্রাথমিক শিক্ষা আইন [Bengal Act VII of 1930]

আইনটির প্রারম্ভে উদ্দেশ্য সম্পর্কে এইরূপ বলা হইল যে বঙ্গদেশের গ্রাম অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, উন্নতির ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনটি পাশের দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে। বাংলা দেশে কলিকাতা শহর এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণ এই আইনের দ্বারা চলিবে। সুতরাং এই আইনটি বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলের জন্য বিশেষ করিয়া রচিত হইল এবং ইহা প্রবর্তিত হইলে বাংলা দেশের ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এই আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

আইনটির প্রধান ধারাগুলি এইরূপ :—

এই আইন অনুযায়ী বাংলা দেশের প্রত্যেকটি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সংঘ (Controlling body) গঠিত হইবে। ইহার নাম হইবে 'জেলা স্কুল বোর্ড'। সরকারের নির্দেশ সাপেক্ষ এই জেলা বোর্ডগুলি স্ব স্ব এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং উহাদের অনুদান (grants) সম্পর্কিত অধিকার লাভ করিবে।

জেলা স্কুল বোর্ডটি নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত হইবে।

সরকারী সদস্য :—(পদাধিকার বলে)

১। জেলাশাসক (District Magistrate),
প্রথম আট বৎসরের জন্য।

২। মহকুমা শাসকগণ (Subdivisional Officers)।

৩। বিদ্যালয় সমূহের জেলা পরিদর্শক (The District Inspector of Schools)।

বেসরকারী সদস্য :—(পদাধিকার বলে)

১। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান।

২। লোকাল বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ।

নির্বাচিত বেসরকারী সদস্য :—

১। জেলা বোর্ডের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য। (নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা জেলার অন্তর্ভূত মহকুমার সংখ্যা অনুসারে স্থির করা হইবে; কিন্তু কোনখানেই এই সংখ্যা দুইএর কম হইবে না।)

২। জেলার অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি মহকুমা হইতে ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটী এবং পঞ্চায়েত সমূহের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত

একজন সদস্য। (এই সংখ্যা সমগ্র জেলায় কোন ক্ষেত্রেই দুইজনের কম হইবে না)

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত একজন প্রাথমিক সদস্য। (প্রথম ৪ বৎসর ইনি সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।)

মনোনীত বেসরকারী সদস্য

সরকার কয়েকজন বেসরকারী সদস্য মনোনীত করিবেন এবং ইহাদের সংখ্যা নির্ধারিত হইবে জেলার অন্তর্গত মহকুমা সমূহের সংখ্যা অনুসারে এবং কোন ক্ষেত্রেই এই সংখ্যা দুইএর কম হইবে না।

আপাতদৃষ্টিতে বোর্ডের অধিকাংশ সভ্যই হইলেন বেসরকারী। প্রত্যেকটি স্কুল বোর্ডই আইন অনুসারে গঠিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থারূপে পরিগণিত হইবে এবং আইনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করিবে।

সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষ প্রত্যেক জেলা স্কুলবোর্ড স্ব স্ব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে।

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যবস্থা।

(খ) এলাকার সবকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার ব্যবস্থা।

(গ) এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের কর্মে নিয়োগ (appointment) এবং মাসিক বেতনের হার নির্ধারণ।

(ঘ) বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতি দান (recognition)।

(ঙ) বিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সাহায্য দান।

(চ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং অ্যান্নুইটি (annuity) ফাণ্ড পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হইলে জেলা স্কুলবোর্ড তাহার দায়িত্বের কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ এবং সংস্কার, বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং পরিচালনা প্রভৃতি সম্পর্কে দায়িত্ব জেলান্তর্গত ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটী বা ইউনিয়ন পঞ্চায়েত সমূহের উপর অর্পণ করিতে পারেন। শেষোক্ত সংস্থা বা ইউনিয়ন পঞ্চায়েতকে ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের আইন-নির্দিষ্ট সংস্থা হিসাবেও পরিগণিত করিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষাকর

১৯৩০ সালেব প্রাথমিক শিক্ষা আইনেই প্রথমে পথকর এবং পাবলিক ওয়ার্কস (public works) করেব মত 'প্রাথমিক শিক্ষা কব' স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। অর্থাভাবে এ পযন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তাবের জন্য কোনরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। এই আইনে শিক্ষা বিস্তাবের জন্য কর স্থাপনের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই অর্থের অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

আইনে এইরূপ ব্যবস্থা রহিল যে এই শিক্ষাকরের হার দেয় খাজনার প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা হিসাবে স্থির করা হইবে। উক্ত পাঁচ পয়সার মধ্যে চাষীর (cultivator) দেয় হইবে সাড়ে তিন পয়সা এবং জমিদারের দেয় হইবে দেড় পয়সা। যাহারা চাষ করে না বা জমির কোন স্বত্ব ভোগ করে না, এইরূপ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে কোনরূপ শিক্ষাকর আদায়ের ব্যবস্থা উপরোক্ত ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না। এই কারণে আইনটিতে জেলা শাসকের উপর এইরূপ ক্ষমতা অর্পিত হইল যে তিনি উক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর উপযুক্ত শিক্ষাকর

বসাইতে পারিবেন। জেলার যে সমস্ত ব্যক্তি ব্যবসা বা অন্য কোন বৃত্তির সাহায্যে জীবিকা অর্জন করেন, তাহারাও এই ব্যবস্থার ফলে এই শিক্ষাকরের আওতার মধ্যে রহিয়া গেলেন। গ্রাম অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষাব জন্য এইরূপ আদায়ীকৃত কর ছাড়া প্রদেশ-সরকার প্রত্যেক বৎসরেব বাজেটে আরও ২৩,৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ করিবেন বলিয়া স্থির হইল। শিক্ষাকর-লব্ধ অর্থ একমাত্র জেলার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নেব জন্যই ব্যয় করা হইবে। শিক্ষকদের ট্রেনিং প্রদানের জন্য এবং বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য যাবতীয় ব্যয় প্রাদেশিক সবকার নিজ তহবিল হইতে ব্যবস্থা করিবেন। এই সমস্ত খরচ কোন ক্রমেই জেলা শিক্ষাফাণ্ড হইতে নির্বাহ করা হইবে না।

সরকার জেলা স্কুলবোর্ডের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন নির্দিষ্ট এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে পারিবেন। যে সকল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হইবে সেই সকল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড পবিচালিত বিদ্যালয়ে অবৈতনিক হইবে। অথবা যে সকল অঞ্চলে এই আইন প্রযুক্ত হইবে এবং শিক্ষাকর ধার্য করা হইবে সেই অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হইলেও, উহা অবৈতনিক হইবে।

যে সকল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে, সেই অঞ্চলের উপযুক্ত বযসের বালক-বালিকাদের কোন নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইতে পারিবে না এবং উপযুক্ত কারণ থাকিলে জেলা স্কুল বোর্ডের অনুমতি অনুসারে ঐরূপ করা যাইতে পারে।

জনসাধারণের দাবী অনুসারে আইনটিতে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিল যে বিদ্যালয় চালু থাকাকালীন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইবে।

কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা-সংস্থা
(Central Primary Education Committee)

আলোচ্য প্রাথমিক শিক্ষা আইনে একটি 'কেন্দ্রীয় প্রাথমিক শিক্ষা সংস্থা' গঠনেরও ব্যবস্থা হইল। এই সংস্থা বা কমিটীর কাজ হইবে জেলা স্কুল বোর্ড সমূহকে নিয়ন্ত্রণ, বিলোপ সাধন (suppression) এবং বোর্ডের দায়িত্বের কিছু বা সম্পূর্ণ অংশ ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটী বা পঞ্চায়েতের উপর অর্পণ করা, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সম্পর্কে ব্যবস্থা করা, পাঠক্রম এবং পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করা এবং আইনের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদান করা।

এই কেন্দ্রীয় কমিটী নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত হইবে।

১। প্রাদেশিক শিক্ষা অধিকর্তা।

২। প্রদেশের পাঁচটি ডিভিশনের প্রত্যেকটি হইতে দুইজন করিয়া নির্বাচিত দশজন সদস্য, ইহারা জেলা স্কুলবোর্ডের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং ইহাদের মধ্যে একজন মুসলমান এবং অন্যজন হিন্দু হইবেন।

৩। বাংলা সরকার কর্তৃক পাঁচজন সদস্য নির্বাচিত হইবেন ও ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন তপশিলীভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইবেন।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও বাংলা সরকার প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংস্থার মতামত প্রয়োজন মনে করিবেন তাহাও সংস্থার মতামতের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

উপরে আমরা বঙ্গদেশীয় প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত দুইটি প্রধান আইনের আলোচনা করিয়াছি। এই দুইটি আইন এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন আলোচনার দ্বারা সমগ্র প্রদেশের প্রাথমিক

শিক্ষা ব্যবস্থার একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালে এই আইন পাশ হইলেও, প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে প্রাথমিক শিক্ষার কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি করা সম্ভবপর হয় নাই। তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট এই আইনের সাহায্যে বাংলা দেশের প্রায় ১৬টি জেলায় 'জেলা স্কুলবোর্ড' গঠন করিলেন। কিন্তু প্রধানত রাজনৈতিক কারণে কয়েকটি জেলায় শিক্ষাকর চালু করিতে পারিলেন না।

'জেলা স্কুলবোর্ড' গঠিত হইবার পরে জেলা বোর্ডসমূহ তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ উক্ত স্কুল বোর্ডসমূহের উপর ন্যস্ত করিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ সরকারী সাহায্য এই স্কুল বোর্ডসমূহকে করা হইল।

বাংলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি অন্য প্রদেশগুলির প্রাথমিক শিক্ষা আইনেও কম বেশি বর্তমান ছিল। তবে স্থানীয় প্রয়োজনবোধে আইনগুলি পুরাপুরি এক না হইলেও, প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে আইনগুলি গৃহীত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে—(১) গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের (Local bodies) উপর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। (২) প্রত্যেকটি প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার ভারও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অর্পিত হইল। (৩) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর 'শিক্ষাকর' বসাইবার ক্ষমতা অর্পিত হইল। (৪) গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থ সাহায্যে রাজি হইলেন এবং (৫) যে সমস্ত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে ঐ সকল অঞ্চলে বিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠাইবার দায়িত্ব পিতামাতার থাকিল; কোন কারণে শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে ছাত্র পাঠাইতে অপারগ হইলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকিল।

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাংলা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইল। অন্যান্য প্রদেশে এই সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ হইলেও বাংলা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হয় নাই বলিলেই চলে। তাহার প্রধান কারণ হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার মত একটি বিরাট প্রয়োজনীয় সংস্কারের ভার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অর্পণ করিয়া আইনের রচয়িতাগণ বিশেষ ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এই ব্যাপারে তাহারা যে ইংলণ্ডের উদাহরণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে এই ধরণের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মারফৎ শিক্ষার বিস্তার ও পরিচালনা চলে তাহা সকল দিক হইতেই ভারতীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে একেবারে পৃথক। ইংলণ্ডে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোন লোক নিযুক্ত হন শিক্ষার সমস্ত বিষয় পরিচালনার জন্য। কিন্তু আমাদের দেশে (বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে) ঐ কাজের ভার দেওয়া হইল সাধাবণত 'জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের' উপর। এই পদটি অবৈতনিক। একজন চেয়ারম্যান যিনি তাহার কাজের জন্য কোন বেতন পান না, যতই দক্ষ হউন না কেন শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিচালনা তাহার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ, জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভৃতির পদ জন সাধারণের ভোটের সাহায্যে অধিকার করিতে হয়। এই অবস্থায় কোন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নিশ্চয়ই এমন কোন কাজ করিবেন না যাহাতে ভবিষ্যতে জনসাধারণ তাহার বিরুদ্ধে ভোট দিতে উৎসাহিত বোধ করিতে পারেন। ভারতের মত দরিদ্র দেশে 'ট্যাক্স' ধার্য করা নিশ্চয়ই এইরূপ একটি কার্য, যাহাতে জনসাধারণের নিকট কাহারও প্রভাব নষ্ট হইতে পারে। ভবিষ্যতে ভোট

হারাইবার ভয়ে বোর্ডের সদস্যেরা নূতন ট্যাক্স ধার্য করিতে রাজি হইলেন না।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অযোগ্যতার অন্যতম কারণ, সদস্যের রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া নির্বাচনে জয়ী হইবার জন্য সাম্প্রদায়িক অবস্থার সুযোগ লইতেন। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত সদস্যরা বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হইতেন। ইহার ফলে বোর্ডের সমস্ত কাজকর্ম যেমন শিক্ষক নির্বাচন, বিদ্যালয়ে সাহায্য মঞ্জুর প্রভৃতি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক হইতেই পরিচালিত হইত। শিক্ষকরাও শিক্ষাদান কার্যে তেমন গুরুত্ব প্রদান না করিয়া কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত থাকিতেন।

১৯২৭ সালে 'সাইমন কমিশনের' অংশ হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থা তদন্ত করিবার জন্য যে কমিটী গঠিত হয় (এই কমিটী 'হার্টগ কমিটী' নামে বিখ্যাত), উহারা উহাদের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে 'স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির' অযোগ্যতা সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করেন। আমরা ঐ মন্তব্য হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"শিক্ষা পরিকল্পনার মত দুরূহ কার্যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যে একেবারে অযোগ্য এবং এই সম্পর্কে তাহাদের কোন পূর্ণ অভিজ্ঞতা নাই ইহা নিঃসন্দেহ। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি এই ব্যাপারে কোন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। শিক্ষক নির্বাচন ও শিক্ষকদের বদলী প্রভৃতি ব্যাপারে এই বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায়। সাধারণত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে 'চেয়ারম্যানই' সর্বেসর্বা, এবং বোর্ডের সমস্ত দায়িত্ব তাহাকেই নির্বাহ করিতে হয়। একজন অনভিজ্ঞ, অবৈতনিক ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করা আদৌ সম্ভব নহে। ইহার ফলে কর্ম পরিচালনায় নানারূপ দুর্নীতি দেখা দিয়াছে। ইহার

বহু প্রমাণ পাওয়া যায় যে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ারম্যানেরা তাহাদের পদমর্যাদার সুযোগ লইয়া নানারূপ অন্যায় কার্যে লিপ্ত আছেন। শিক্ষকদের ভোট সংগ্রহের কার্যে নিযুক্ত করা হয়, এবং নির্বাচনের সময় দলীয় শিক্ষকদের সুবিধামত স্থানে বদলী করা হয়, যাহাতে উহাদের দ্বারা নির্বাচনের সময় ভোট সংগ্রহে সুবিধা হইতে পারে। সরকারী পরিদর্শকমণ্ডলীর পরামর্শ এই ব্যাপারে আদৌ গ্রহণ করা হয় না এবং কেহ উহা প্রদান করিলে অগ্রাহ্য করা হয়। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় যে শিক্ষকেরা বোর্ডের প্রভাবশালী সদস্যদের খুসি করিয়া নিজেদের চাকুরীর সুবিধার জন্য সচেষ্ট হইবেন ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহার ফলেই বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা ব্যাপারে অবনতি দেখা দিয়াছে এবং শিক্ষকদের ভিতর শৃঙ্খলাবোধও বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। হার্টগ কমিটীর রিপোর্টে বিহার প্রদেশের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—বোর্ডের জনৈক সদস্য তাহার পদমর্যাদার সুযোগ লইয়া শিক্ষকদের নিকট হইতে টাকা ধার লইয়াছেন এবং উহা তিনি পরিশোধে অনিচ্ছুক। বিদ্যালয় ভবন নির্মাণেও নানা মারাত্মক দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। বিহার প্রদেশে একটি বোর্ডের চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রায় ৩০০৲ টাকা নিজ গৃহ নির্মাণে ব্যয় করেন এবং ঐ সম্পর্কে কিছু করা সম্ভব হয় না।"

স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মারফৎ প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা যে সকল কারণে ছিল না আমরা হার্টগ কমিটীর রিপোর্ট হইতে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিয়াছি। কয়েকজন ব্যক্তির স্বেচ্ছামূলক কার্যের উপর প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ভার অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা হইতেও উহা প্রমাণিত হয়। এই প্রসঙ্গে অন্য একটী কারণও বিশেষ

উল্লেখযোগ্য অর্থাৎ শিক্ষা ব্যাপারে 'দ্বৈত শাসন-নীতি'। বোর্ডের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হইলেও, কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোন পরিদর্শকমণ্ডলী (Inspectors) ছিল না। ইহার ফলে কার্য পরিচালনায় নানাবিধ ত্রুটী দেখা দেয়। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে রিপোর্ট ঠিক সময়ে পাওয়া সম্ভব হইত না। এইজন্য হার্টগ কমিটীর সিদ্ধান্ত এই ছিল যে গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা ও বিস্তারের জন্য আরও অধিক ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত। বোর্ডের হাতে যদি ক্ষমতা রাখিতেই হয় তবে, কর ধার্য, শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে বোর্ডের ক্ষমতা সরকারকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা উচিত এবং এই উপলক্ষে দেশের প্রকৃত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। দেশের নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে যত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল তাহা আদৌ করা হয় নাই, এবং প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কদের জন্য শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করিয়া দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে গণতন্ত্র চালু করিতে চেষ্টা করিলে যে তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য এই সত্য দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করিতে পারিবেন ততই দেশের মঙ্গল ত্বরান্বিত হইবে।

১৯৪৪ সালের ইংলণ্ডের শিক্ষা আইন

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা, স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষার নব রূপায়ন, দ্বৈত শাসন, ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে ব্যবস্থা, বিত্থালয় শাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষকদের নিয়োগ ও কর্মচ্যুতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা, পিতামাতার দায়িত্ব, বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স, অধিকতর শিক্ষা, বিত্থালয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ, বিত্থালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খাদ্য এবং দুগ্ধের ব্যবস্থা, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অন্যান্য সুযোগের ব্যবস্থা, মাধ্যমিক বিত্থালয়ের বেতন সম্পর্কে, স্বাধীন বেসরকারী বিত্থালয় সম্পর্কে, পরিদর্শক নিয়োগ, শিক্ষাসম্পর্কে গবেষণা, আর্থিক ব্যবস্থা, শিক্ষা আইনের সমালোচনা।

১৯৪৪ সালের ইংলণ্ডের শিক্ষা আইন, যাহা 'বাটলার আইন' (Butlar Act) নামেও বিখ্যাত, ইংলণ্ডের শিক্ষাসংস্কার ও সংগঠনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। জাতীয় আইনগুলি যদি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব স্বরূপ হয়, তবে আমরা মনে করিতে পারি যে আলোচ্য আইনটিতে শিক্ষাসংস্কার ও অধিকারের ব্যাপারে ইংরেজ জাতির বহুদিনের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতির অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের ৩রা আগষ্ট তারিখে এই আইনটি পার্লামেণ্টে উভয় সভায় আলোচনার পর বিধিবদ্ধ হয়।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনটি পাঁচটি অংশে (parts) এবং ১২২টি ধারায় (clauses) বিভক্ত, ইহা ছাড়া ইহাতে আরও ৯টি পরিশিষ্ট (schedules) যুক্ত আছে।

আইনটির **প্রথম অংশে** আলোচনা করা হইয়াছে—কেন্দ্রীয় শাসন, শিক্ষা-মন্ত্রীর দায়িত্ব এবং মন্ত্রীর পরামর্শদাতা সংস্থার গঠন প্রণালী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়। প্রথম অংশে ১ হইতে ৫ পর্যন্ত ধারা যুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশে (৬-৬৯ ধারা পর্যন্ত) শিক্ষার আইন-সঙ্গত ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, আংশিক (part time), কারিগরী (technical), বয়স্ক শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারা আলোচিত হইয়াছে।

তৃতীয় অংশে (৭০-৭৫ ধারা পর্যন্ত) বেসরকারী, সরকারী শাসন বহির্ভূত বিদ্যালয়সমূহের বিষয় লইয়া বিভিন্ন ধারা যুক্ত হইয়াছে।

চতুর্থ অংশে (৭৬-১০৭ ধারা পর্যন্ত) বিভিন্ন বিষয় যেমন,—বিদ্যালয় পরিদর্শন, বৃত্তি প্রদান, পিতামাতার দায়িত্ব ও অধিকার এবং শিক্ষামন্ত্রী ও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের মধ্যে অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা

সম্পর্কে এবং শিক্ষাব্যাপারে অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা ও সাহায্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধারা যুক্ত হইয়াছে।

পঞ্চম অংশে (১০৮ হইতে ১২২ ধারা পর্যন্ত) আইনটি কার্যে পরিণত করিবার উপযোগী বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং এই অংশে বিভিন্ন শব্দ ও বিষয়ের ব্যাখ্যা যুক্ত হইয়াছে।

পরিশিষ্টের অন্তর্গত নয়টি অংশে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার গঠনতন্ত্র, ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন ধারা সংযুক্ত আছে এবং পূর্বতন আইনগুলির সংশোধন ও বাতিল সংক্রান্ত ধারাও এই অংশে যুক্ত করা হইয়াছে।

আইনটির **প্রথম** এবং **পঞ্চম** অংশ রাজকীয় অনুমতি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই চালু করা হয়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ অংশ ১৯৪৫-সালের ১লা এপ্রিল হইতে কাজে লাগান হয় এবং তৃতীয় অংশ সম্পর্কে স্থির হইল যে পরামর্শদাতা সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট দিন হইতে চালু করা হইবে।

[**মন্তব্য :** কিন্তু বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্বে ১৫ বৎসর করা সম্ভব হয় নাই।]

আইনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

১। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Central Administration)

১৯০০ সাল হইতে ইংলণ্ডে শিক্ষাবোর্ড স্থাপিত হইবার পর শিক্ষা-বিষয়ক সমস্ত কার্য উক্ত বোর্ডের সভাপতি কর্তৃক নির্বাহ হইত। কিন্তু ১৯৪৪ সালের শিক্ষা-আইনে সভাপতির পরিবর্তে একজন **মন্ত্রীর হস্তে শিক্ষাদপ্তরের** ভার প্রদান করা হইল। পূর্বে সভাপতির কার্য ছিল ইংলণ্ড ও ওয়েলস্-এর শিক্ষা-ব্যবস্থা তদারক করা। কিন্তু ১৯৪৪

সালের আইনে শিক্ষামন্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে এইরূপ বলা হইল যে ইংলণ্ড ও ওয়েলস্‌বাসীদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নতির দিকে পরিচালিত করা এবং 'স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ'গুলির সহযোগিতায় প্রত্যেক অঞ্চলে জাতীয় নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে নেতৃত্ব করা।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ইংলণ্ডের মত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জাতি শিক্ষা-মন্ত্রীর হস্তে এই ধারার সাহায্যে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করিয়া স্থানীয় শাসনের নীতিকে গুরুতরভাবে দুর্বল করিল কিনা। কিন্তু আইনের অন্য ধারাগুলি পরীক্ষা করিলে এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ এই অংশের অন্য ধারায় (৫নং ধারা) বলা হইতেছে যে তাহাকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইল তাহা শিক্ষামন্ত্রী কি ভাবে প্রয়োগ করিতে চাহেন, সেই সম্পর্কে একটি পূর্ণ বিবরণ পার্লামেণ্টের সম্মুখে তাহাকে উপস্থিত করিতে হইবে। তিনি যদি অন্য কোন নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে চাহেন তাহা হইলে তাহাকে পার্লামেণ্টের উভয় সভায় উহা পাশ করাইয়া লইতে হইবে এবং ঐ নিয়মাবলী পরিবর্তনেরও অধিকাব থাকিবে। অধিকন্তু শিক্ষামন্ত্রীকে সর্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

শিক্ষামন্ত্রীর কার্যকে আরও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আইনটির ৪নং ধারায় অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইল। এই ধারায় উল্লিখিত হইল যে শিক্ষামন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য দুইটি **কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি** (Central Advisory Councils) গঠন করিতে হইবে—একটি ইংলণ্ড এবং অন্যটি ওয়েলস্‌-এর জন্য। উপদেষ্টা সমিতির দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হইল যে উহারা শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয় প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, সেই সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়কে পরামর্শ দিবেন অথবা মন্ত্রী যদি কোন বিষয় সম্পর্কে

উহাদের পরামর্শ প্রয়োজনীয় মনে করেন তবে তাহারা ঐ সম্পর্কেও তাহাকে সাহায্য করিবেন।

নূতন উপদেষ্টা কমিটীর হস্তে পূর্বতন উপদেষ্টা কমিটী অপেক্ষা ক্ষমতা বেশি অর্পণ করা হইল। কারণ পূর্বতন উপদেষ্টা কমিটী অগ্রণী হইয়া কিছু করিতে পাবিতেন না। পরবর্তী ধারা (৫নং) অনুযায়ী শিক্ষামন্ত্রীকে উপদেষ্টা সমিতি দুইটির, সভাপতি নিয়োগ, সদস্য মনোনয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের ভার প্রদান করা হইল। তবে ইহাও উল্লিখিত হইল যে এই সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ পার্লামেণ্টে দাখিল কবিতে হইবে। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির সভাপতি ও সদস্যদের কাযকাল হইল তিন বৎসরের জন্য। তবে শিক্ষামন্ত্রী প্রয়োজনবোধ করিলে উহা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

২। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা (Local Administration)

স্থানীয় শাসন ব্যাপারেও আলোচ্য আইনটির দ্বারা ব্যাপক পরিবর্তন আনা হইল। এতকাল ইংলণ্ডেব শিক্ষা-ব্যবস্থা ১৯০২ সালের শিক্ষা আইন অনুযায়ী চলিতেছিল। এই ১৯০২ সালের আইন অনুযায়ী এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে সমস্ত বৃহৎ শাসন এলাকার কর্তৃপক্ষ যেমন জেলা বা কাউণ্টী কাউন্সিল বা কাউণ্টী মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল সমূহ (County Councils and County Borough Councils) স্ব স্ব এলাকার প্রাথমিক এবং উচ্চতর উভয় প্রকারের শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ১৯০২ সালের আইন অনুযায়ী ইহাদের বলা হয় Part II Authority বা আইনের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ১৯০২ সালের আইনে প্রাথমিক শিক্ষা (Elementary Education) এর পরিচালনার জন্য অন্য ধরণের 'স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের' ব্যবস্থা ছিল। যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটীর (Borough) বা সহরতলী জেলার (Urban District) জনসংখ্যা

যথাক্রমে (১৯০১ সালের আদম সুমারী অনুসারে) ১০,০০০ এবং ২০,০০০ এর অধিক হইবে, সেই সেই অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ভারও থাকিবে উক্ত কর্তৃপক্ষগুলির উপর। ১৯০২ সালের শিক্ষা আইনে ইহাদের নাম হইল Part III Authorities বা আইনের তৃতীয় বিভাগে বর্ণিত কর্তৃপক্ষ।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইন অনুযায়ী সর্বপ্রকার শিক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা কাউন্সিল এবং কাউন্টী মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলগুলির উপর ভার অর্পণ করা হইল। অর্থাৎ ১৯০২ সালে Part II Authorities স্ব স্ব এলাকায় সর্বপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন স্থির হইল এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ হিসাবে Part III Authorities-গুলিকে বাতিল করা হইল। তবে এই সম্পর্কে কিছু পৃথক ব্যবস্থাও থাকিল। কারণ এই ব্যবস্থায় কোন কোন বরো কাউন্সিল (Borough Council) এবং সহরতলী জেলা কাউন্সিল (Urban District Council) তাহাদের কর্তৃত্ব ত্যাগ করিতে আপত্তি করিলেন। ইহার ফলে স্থির হইল যে, যে সকল অঞ্চলের জনসংখ্যা ১৯৩৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত ৬০,০০০ এবং যে সকল অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৭,০০০ ছিল, সেইগুলিকে **'ব্যতিক্রম জেলা'** (Excepted Districts) এবং ঐ অঞ্চলের কর্তৃপক্ষকে **ডিভিসনাল এক্সিকিউটিভ** (Divisional Executives) আখ্যা দেওয়া হইবে এবং উহারা স্ব স্ব এলাকায় প্রাথমিক ও উচ্চতর উভয় প্রকারের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইবেন। তবে এই সকল শিক্ষাকর্তৃপক্ষের কর-ধার্য এবং অর্থসংগ্রহের অধিকার থাকিবে না। ইহাদের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাও কাউন্টী কাউন্সিলের মারফৎ শিক্ষামন্ত্রীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। আবার ইহাও স্থির হইল যে উপযুক্ত মনে করিলে শিক্ষামন্ত্রী অন্য

কাউন্সিলদের জন্ত এই সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'ব্যতিক্রম জেলা' ও 'ডিভিসনাল এক্সিকিউটিভ্' এর মারফৎ Part III Authorities-কে বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

আইনে উপরোক্ত ব্যবস্থার ফলে 'স্থানিকের' সংখ্যা অনেক কমিয়া গেল এবং দুর্বল 'স্থানিক'-গুলির স্থানে এইরূপ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে কর্তৃত্বভার অর্পিত হইল যে যাহারা স্ব স্ব এলাকায় শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনে সক্ষম।

৩। শিক্ষার নব রূপায়ণ (The System·recast)

আইনটির সপ্তম ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ধারায় পুরাতন শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পবিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। পূর্বে ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থা দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রাথমিক (Elementary) এবং উচ্চতর (Higher)। প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত শিক্ষাই উচ্চতর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ইহাতে মারাত্মক অসুবিধার কারণ ঘটিত। কারণ পূর্বব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা চলিত ১৪ বৎসর পর্যন্ত, কিন্তু মধ্যশিক্ষা (Secondary Education) আরম্ভ হইত ১১ + বৎসর হইতে এবং কাবিগরী শিক্ষা (Technical Education) আরম্ভ হইত ১২ অথবা ১৩ বৎসর হইতে। অধিকন্তু এই মধ্যশিক্ষা ও কারিগবী শিক্ষালাভের সুবিধা অধিকাংশ বালক-বালিকাদের ছিল না। তাহাদের অধিকাংশই (৯০%) একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা (১৪ বৎসর পর্যন্ত) লাভের সুযোগ পাইত। যে কৈশোরকালে বালক-বালিকাদের বিদ্যালয়ে সুস্থ আবহাওয়ায় কাটান উচিত সেই সময় তাহাদের বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইত। সপ্তম ধারায় এই বিষয়টির উন্নতি সাধন করা হইল।

এই ধারায় বলা হইল,—

জাতীয় আইনগত শিক্ষা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি স্তরে বিভক্ত হইবে,—যেমন প্রাথমিক (Primary), মধ্য ও অধিকতর শিক্ষা (Further Education)। প্রতি অঞ্চলের অধিবাসীদের এই তিন স্তরের শিক্ষার যথোচিত সুযোগ প্রদান করিয়া যথাসাধ্য জাতির শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক কল্যাণ সাধন করা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

পূর্বে 'স্থানিক'-গুলি একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য ছিল এবং মধ্যশিক্ষার ব্যাপারে একমাত্র ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ছিল Part II authorities-গুলি। তবে এই সম্পর্কে তাহাদের কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই নূতন আইনে পূর্বতন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা হইল এবং সকল স্তরে সুষ্ঠু শিক্ষা প্রদানের আইনগত দায়িত্ব অর্পিত হইল 'স্থানিক'-গুলির উপর।

আইনে প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষার সংজ্ঞা নিরূপিত হইল। 'প্রাথমিক শিক্ষা' সম্পর্কে এইরূপ বলা হইল যে ইহা ১২ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের পূর্ণ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা এবং মধ্যশিক্ষা হইবে ১২ বৎসরেরও বেশি এবং ১৯ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য পূর্ণসময়ের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা। উক্ত দুই স্তরের শিক্ষা ছাড়া 'স্থানিক'-গুলির উপর এইরূপ নির্দেশ থাকিল যে উহারা (১) প্রাইমারী ও মধ্য-শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিবে। (২) পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিবে। (৩) শারীরিক ও মানসিক ক্লৈব্য-গ্রস্থ শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ইহারা করিবে। (৪) প্রয়োজন ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও ইহাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

'স্থানিক'-গুলির বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষমতা থাকিবে। 'স্থানিক দের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিকে বলা হইল 'কাউন্টী বিদ্যালয়' (County Schools) এবং বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির নাম করা হইল 'বেসরকারী' বিদ্যালয় বা স্বেচ্ছা-শিক্ষালয় (Voluntary Schools)। বিদ্যালয় গৃহের মান (Standard) সম্পর্কেও আইনে ব্যবস্থা থাকিল।

আইনে এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে আইনটির দ্বিতীয় অংশ (Part II) চালু হইবার এক বৎসরের মধ্যে 'স্থানিক'-গুলি স্ব স্ব অঞ্চলের শিক্ষার উন্নতির উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষা পরিকল্পনা (development plan) প্রস্তুত করিবে। শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক উক্ত 'শিক্ষা পরিকল্পনা' পরীক্ষার পর একটি 'স্থানীয় শিক্ষা অনুমোদন' আদেশ (Local Education order) প্রদান করিয়া উহাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্তব্য নির্দেশ করা হইবে। অবশ্য মন্ত্রীর আদেশ পরিবর্তনেরও ব্যবস্থা রাখা হইল। কিছু সর্তসাপেক্ষ কোন বেসরকারী বিদ্যালয়কে বাতিল করিবারও ব্যবস্থা থাকিল।

৪। দ্বৈত-শাসন (Dual Contr l)

আলোচ্য আইনটির অন্যতম বিশেষ ব্যবস্থা হইল এই যে ইহাতে ইংলণ্ডের শিক্ষা পরিচালনায় যে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বর্তমান ছিল তাহাদের মধ্যে একটি সর্বসম্মত আপোষের চেষ্টা করা হইল। আইনটির ১৫ ধারায় তিন শ্রেণীর স্বেচ্ছা-বিদ্যালয় নাম করা হইল, যথা—নিয়ন্ত্রিত (Controlled), সাহায্য-প্রাপ্ত (Aided) এবং বিশেষ চুক্তিবদ্ধ (Special Agreement)।

নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়গুলির উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন 'স্থানিক'-গুলি তাহা বহন করিবে। ইহাদের পরিচালকদের এই সম্পর্কে কোন দায়িত্ব থাকিবে না।

সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বিশেষ চুক্তিবদ্ধ বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা হইল এই যে বিদ্যালয়গুলির গৃহের উন্নয়ন, বহির্বিভাগের মেরামত প্রভৃতি ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অর্ধেক ব্যয় বহন করিতে হইবে এবং বাকি অর্ধেক বহন করিবে 'স্থানিক'-গুলি। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলির খরচ নির্বাহের জন্য 'স্থানিক'-গুলি দায়ী থাকিবে—

(১) পরিচালনার খরচ, (২) শিক্ষকদের বেতন, (৩) বিদ্যালয় গৃহের আভ্যন্তরীণ অংশ মেরামত, (৪) খেলার স্থান, এবং (৫) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ছাত্রছাত্রীদের খাদ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি।

বিশেষ চুক্তিবদ্ধ বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার খরচ অবশ্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহিত পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা হইবে।

এই বিশেষ চুক্তিবদ্ধ বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়গুলি ১৯৩৬ সালের ইংলণ্ডের শিক্ষা আইন অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ এক নূতন ধরণের বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য নূতন স্কুলগৃহ নির্মাণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই উদ্দেশ্যে বেসরকারী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্মে আবেদন চাওয়া হয় যে 'স্থানিক'-গুলির প্রস্তাব অনুযায়ী স্কুলগৃহ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের শতকরা ৫০-৭৫ ভাগ 'স্থানিক'-গুলি প্রদান করিবে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হয় না। ১৯৪৪ সালের আইনে এই পুরাতন নিয়মের পুনঃ প্রবর্তন করা হইল।

৫। ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে ব্যবস্থা

গভর্ণমেণ্ট ও বেসরকারী বিদ্যালয় (Voluntary Schools) এর মধ্যে লাভ-ক্ষতির হিসাব পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য

করা যায় যে, (১) বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা (Management), (২) ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা, (৩) শিক্ষক নিয়োগ ও কর্মচ্যুতির সর্ত সম্পর্কে বেসরকারী বিদ্যালয়কে কিছু কিছু অধিকার ত্যাগ করিতে হইল।

প্রথমে আমরা ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছি। আলোচ্য আইনের ২৩ ধারায় এইরূপ উল্লেখ আছে যে কাউন্টী বিদ্যালয় এবং স্বেচ্ছা-বিদ্যালয়গুলিতে (সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয় বাদে) সর্বপ্রকার সাধারণ শিক্ষাব (Secular Education) দায়িত্ব থাকিবে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর এবং সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব থাকিবে পরিচালকমণ্ডলীর উপর।

ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে (২৫ ধারায়) এইরূপ উল্লেখ থাকিল যে বোর্ড পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি এবং স্বেচ্ছা-বিদ্যালয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের সমবেত উপাসনার দ্বারা আরম্ভ হইবে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর বিদ্যালয়েই ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। তবে অভিভাবক কিংবা পিতা-মাতা আপত্তি করিলে কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা বাধ্যতা-মূলক হইবে না। তবে এই ধর্মশিক্ষা কাউন্টী স্কুলে হইবে সর্বসম্মতি-ক্রমে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এবং নিয়ন্ত্রিত স্কুলে হইবে ঐ বিশেষ বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসারে। এই শিক্ষা বিশেষ শিক্ষক দ্বারা (Reserved teachers) সপ্তাহে দুই ঘণ্টার বেশি দেওয়া চলিবে না।

সাহায্য-প্রাপ্ত এবং বিশেষ চুক্তিবদ্ধ বিদ্যালয়গুলিতে ট্রাষ্টির ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে ধর্মশিক্ষা পরিচালিত হইবে, অর্থাৎ এই দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা বিশেষ ধর্ম মতানুযায়ী দেওয়া হইবে এইরূপ ধরিয়া লওয়া যায়।

৬। বিদ্যালয় শাসন ব্যবস্থা (School Governance)

প্রত্যেক বিদ্যালয়কে আপন আপন ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য

সম্পাদন করিতে হইলে প্রত্যেকের নিজস্ব পরিচালন-ব্যবস্থা (Management) থাকা উচিত। অবশ্য ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের পূর্বেই এইরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং বর্তমানেও এইরূপ ব্যবস্থা রাখা হইল যে প্রত্যেক কাউন্টী বিদ্যালয় এবং স্বেচ্ছা-বিদ্যালয়ের জন্য পরিচালক সমিতি (Body of managers or governors) থাকিবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইহাদের নাম দেওয়া হইল 'পরিচালক সঙ্ঘ'' (management) এবং মধ্যবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইহাদের নাম দেওয়া হইল 'ব্যবস্থাপক সঙ্ঘ' (Government)।

উভয় প্রকারের বিদ্যালয় পরিচালনার নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবে স্থানীয় শিক্ষা কমিটী, তবে মধ্যবিদ্যালয়ের নিয়মাবলী সম্পর্কে শিক্ষা-মন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

স্বেচ্ছা-বিদ্যালয়গুলির নিয়মাবলী শিক্ষামন্ত্রীর আদেশ অনুযায়ী (Order) প্রণীত হইবে। তবে এই সম্পর্কে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বা অন্য কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা শিক্ষামন্ত্রীর নিকট উপস্থিত করা যাইবে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মধ্যবিদ্যালয়-গুলিকে পরিচালনার ক্ষেত্রে আরও বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হইল। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পক্ষে এই স্বাধীনতা তদনুরূপ হইল না।

যে সমস্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্র শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলির (Minor authorities) উপর কার্য পরিচালনার দায়িত্ব থাকিবে সেইখানে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালক সমিতির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়োগ করিবে এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ নিয়োগ করিবে অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য।

সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয় অথবা বিশেষ চুক্তিবদ্ধ বিদ্যালয়ের

ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাতাদের পক্ষে হইতে নিযুক্ত করা হইবে দুই-তৃতীয়াংশ এবং নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই হার হইবে এক-তৃতীয়াংশ।

পরিচালক সমিতির সদস্য সংখ্যা ছয়জনের কম হইবে না। পূর্বের আইনে এই সংখ্যা ছয়ের বেশি হইবে না এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মধ্য বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এইরূপ কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। ইহাতে উভয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ভিতরে পরিচালনার ব্যাপারে যে পার্থক্য ছিল তাহা অনেক কমিয়া গেল এবং শিক্ষা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিদের বিদ্যালয়-পরিচালনা-কমিটীতে আনয়ন করা সম্ভব হইল।

মধ্য বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি গঠনের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে কাউন্টী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইহাদের নিযুক্ত করিবে 'স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' এবং স্বেচ্ছা-বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ইহারা নিযুক্ত হইবেন শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারা। তবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে এই গঠনতন্ত্রে যেরূপ ব্যবস্থা ছিল মধ্যশিক্ষার ক্ষেত্রেও তাহা বজায় রাখা হইল।

আইনটির ২০ নং ধারায় এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধ করিলে দুই বা ততোধিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি মাত্র ম্যানেজিং কমিটী নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তবে স্বেচ্ছা-বিদ্যালয়ের পক্ষে সংশ্লিষ্ট স্কুলসমূহের ম্যানেজারদের মত প্রয়োজন হইবে।

এই ধারার গুরুত্ব এই যে কোন স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ক্ষমতা-লোভী হইলে এই ধারার সাহায্যে স্থানীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইতে চেষ্টা করিতে পারেন। এই কারণে এই ধারা লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হয় এবং গভর্ণমেণ্টের মত এই যে যখন স্কুল পরিচালক-কমিটী তৈয়ারী করিবার মত উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে না তখনই এইরূপ ব্যবস্থার অধিকার থাকিল।

৭। শিক্ষকদের নিয়োগ ও কর্মচ্যুতি সম্পর্কিত ব্যবস্থা
(Appointment and Dismissal of teachers)

শিক্ষা-ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করে উপযুক্ত দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষকবৃন্দের উপর। শিক্ষকতা বৃত্তি হিসাবে যদি লোভনীয় এবং গৌরবের না হয়, তবে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন কেহই এই বৃত্তি গ্রহণে উৎসাহ বোধ করিবে না। সুতরাং ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে শিক্ষকদের কর্মের স্থায়িত্ব ও সুযোগ সম্পর্কে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সেই সম্পর্কে সকলের আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক।

(ক) **শিক্ষকদের শিক্ষা**: এই সম্পর্কে স্থির করা হইল যে শিক্ষামন্ত্রী এই সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য অধিকার প্রদান করিবেন।

(খ) **শিক্ষকদের বেতন**: শিক্ষকদের বেতনের উপযুক্ত হার স্থির করিবার জন্য এক বা একের অধিক কমিটী থাকিবে এবং এই কমিটীকে শিক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। এই বেতন কমিটীতে 'স্থানিক', এবং শিক্ষক উভয় স্বার্থের প্রতিনিধি থাকিবে। এই কমিটী শিক্ষকদের জন্য যে বেতনের হার স্থির করিবেন এবং মন্ত্রী মহাশয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন, শিক্ষামন্ত্রী সেই হার অনুমোদন করিলে ইহা সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষকদের বেতনের হার বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯১৯ সাল হইতে 'বার্ণাম কমিটী'-গুলি এই কার্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এই কমিটীর প্রদত্ত হার সমস্ত স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নিকট গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল না। ১৯৪৪ সালের আইনে এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে শিক্ষামন্ত্রী এই কমিটী-প্রদত্ত বেতনের হার অনুমোদন

করিলে সমস্ত স্থানীয় কমিটীগুলিকে উহা নিজেদের এলাকায় চালু করিবার জন্য বাধ্য থাকিতে হইবে।

(গ) **শিক্ষক নিয়োগ ও কর্মচ্যুতি :** শিক্ষকদের নিকট এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে এই বিষয়টি সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট আইন ছিল না। ১৯৪৪ সালের আইনে এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৪ ধারায় এইরূপ ব্যবস্থা রাখা হইল যে কাউন্টী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মে নিয়োগ এবং বরখাস্ত করিবার অধিকার একমাত্র স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের থাকিবে।

নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় অথবা বিশেষ চুক্তি-সম্পন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের আংশিক অধিকার থাকিবে। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ম্যানেজার অথবা গভর্ণরদের রিজার্ভ শিক্ষক নিয়োগে (Reserve teachers) মতামত প্রদানের অধিকার থাকিবে এবং সাধারণ শিক্ষক নিয়োগের সময় পূর্ববর্তী চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার থাকিবে। **কিন্তু কোন শিক্ষককেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বরখাস্ত করা যাইবে না।** তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্ম শিক্ষা প্রদানের জন্য নিযুক্ত শিক্ষক ঐ কাযে অনুপযুক্ত হইলে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াও বরখাস্ত করা যাইতে পারে।

পূর্বে বিবাহিত মহিলা শিক্ষকদের চাকুরীতে রাখা হইত না। নূতন আইনে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইল। আইনে অন্য একটি উল্লেখ-যোগ্য ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হইল। কোন বিশেষ ধরণের ধর্মমত পোষণের জন্য কোন শিক্ষককে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা চলিবে না। ধর্মমতের ভিত্তিতে শিক্ষকদের উচ্চতর চাকুরীতে প্রমোশনের ব্যবস্থাও রহিত করা হইল।

শিক্ষকদের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতা নির্ধারিত হইল—

১। শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

২। উপযুক্ত স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাদানের যোগ্য শারীরিক সুস্থতার অধিকারী হইতে হইবে।

৩। শিক্ষকদের নিয়োগের পর স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ নিয়োগ পত্র প্রদান করিবেন এবং ঐ নিয়োগ পত্রে শিক্ষকদের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ থাকিবে। তিনি স্কুলের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য ছাড়া অন্য কোন কার্য করিবেন না এবং বিদ্যালয়ের বাহিরেও এমন কোন কার্য করিবেন না যাহা তাহার শিক্ষাদান কার্যে বাধা সৃষ্টি করে।

৮। পিতামাতার দায়িত্ব, বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স

নূতন আইনে বালক-বালিকাদের বিদ্যালয় পরিত্যাগের বয়স ১৫ বৎসর স্থির করা হইল। পূর্বে পিতামাতার দায়িত্ব ছিল ৫ হইতে ১৪ বৎসরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। নূতন আইনে উহা করা হইল ৫ হইতে ১৫ বৎসর। এই বয়সে লেখাপড়া শিক্ষা করা বালক-বালিকাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইল এবং শিক্ষামন্ত্রী প্রয়োজন বোধ করিলে পার্লামেণ্টের অনুমতি লইয়া এই বয়স ১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

পিতামাতার পক্ষে শিশুর শিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক করা হইল এবং এই নিয়ম কেহ ভঙ্গ করিলে তাহার জন্য অর্থদণ্ড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কারাবাসের ব্যবস্থা রাখা হইল। তবে শিশুর অসুস্থতা, ধর্মসংক্রান্ত কোন কারণ অথবা যদি শিশু বিদ্যালয় হইতে তিন মাইল অথবা বেশি দূরে অবস্থান করে এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দ্বারা উপযুক্ত যানবাহন অথবা বোর্ডিং এর ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। শিশুর বয়স যদি ৮

বৎসরের কম হয় তবে এই দূরত্ব ২ মাইল ধরা হইবে। ৬ বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বালিকাদের পক্ষে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সংখ্যা হইবে এক বৎসরে ২০০, ইহা ১০০ দিন উপস্থিতির সমতুল্য। এইরূপ উপস্থিতিকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি (regular attendance) হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। তবে যে সমস্ত পিতামাতা বদলীর চাকুরী করেন তাহাদের সন্তানদের পক্ষে এই নিয়মের কিছু পরিবর্তন হইবে। তবে এইরূপ আশা করা হইল যে এই সব ক্ষেত্রে পিতামাতার বোর্ডিং এর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইবেন, কারণ উপযুক্ত শিক্ষার জন্য শিশুকে এইরূপ পরিবেশের মধ্যে রাখা প্রয়োজন যেখানে সে নির্ভয়ে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বিচরণ করিতে পারে।

অপরাধী পিতামাতার ক্ষেত্রে আদালতের সাহায্যে এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে যাহাতে এইরূপ শিশুকে শিশু আদালতের নিকট উপস্থিত করা হয়। সেখান হইতে তাহার শিক্ষা ও যত্নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে একটি বিষয় যুক্ত করা প্রয়োজন। আইনটির ৭৬ নং ধারায় বলা হইয়াছে যে পিতামাতা তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী শিশুকে শিক্ষিত করিতে পারিবেন। (Pupils are to be educated in accordance with the wishes of the parents)

আইনটির ৮১ নং ধারাটিও পিতামাতা ও অভিভাবকদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শিক্ষামন্ত্রী স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষমতা অর্পণ করিয়া নিয়ম (regulations) প্রণয়ন করিবেন।

(ক) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে (activities) অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদিগকে খরচ দিতে পারিবেন।

(খ) যদি কোন বালক-বালিকা এমন কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় যেখানে পড়িবার জন্য বেতন প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঐ বেতনের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ প্রদান করিতে পারিবেন।

(গ) যে সমস্ত তরুণ-তরুণী পড়িবার বাধ্যতামূলক বয়স অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের পড়াশোনা চালাইবার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বৃত্তি ও নানাবিধ অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। যে সমস্ত ব্যক্তি শিক্ষণশিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন তাহারাও এই সাহায্য পাইতে পারিবেন।

উপরের সুযোগ-সুবিধাগুলির উদ্দেশ্য হইল যে উহাদের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ সুবিধার মধ্যে নিজেদের পড়াশোনা চালাইয়া যাইতে পারে।

৯। অধিকতর শিক্ষা (Further Education)

১৯৪৪ সালের আইনের ৪১-৪৭ ধারায় অধিকতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বলা হইয়াছে। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের কর্তব্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে উহারা স্ব স্ব এলাকায় বাধ্যতামূলক বয়স অপেক্ষা অধিক বয়স্ক তরুণ-তরুণীদের জন্য সকল সময়ের (full time) এবং আংশিক সময়ের (Part time) শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে এবং উহাদের জন্য অবসর বিনোদনের উপযোগী উপযুক্ত ব্যবস্থা,—যেমন সাংস্কৃতিক শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকারের চিত্তবিনোদনের উপযোগী বন্দোবস্ত প্রভৃতিরও ব্যবস্থা থাকিবে। স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিবেন এবং এই সকল ব্যাপারে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কার্য পরিচালনা করিবেন।

আইনের এই ধারায় 'অধিকতর শিক্ষা পরিচালনা'য় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। বয়স্ক শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্যও এই সহযোগিতার নীতি স্বীকার করা হইয়াছে।

আংশিক সময়ের শিক্ষার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যে সমস্ত তরুণ-তরুণী বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স অতিক্রম করিয়াছে এবং যাহারা অন্য কোন স্থানে সকল সময়ের শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় নাই, তাহাদের জন্য ১৯১৮ সালের আইনে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে তাহারা তাহাদের ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত আংশিক শিক্ষা লাভের অধিকারী হইবে। সপ্তাহে একদিন এই শিক্ষালাভের জন্য তাহাদিগকে চাকুরী হইতে ছুটি দেওয়া হইবে। বিভিন্ন কারণে ১৯১৮ সালের উক্ত ব্যবস্থা সফল হইতে পারে নাই।

১৯৪৪ সালের আইনে এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে আইনের এই অংশটি চালু করিবার তিন বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ বিদ্যালয় পরিত্যাগের বয়স ১৫ বৎসর বাড়াইবার তিন বৎসরের মধ্যে কিশোর-কিশোরীদের ১৮ বৎসর পযন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক আংশিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষালয়ে উপস্থিতির হার হইবে পুরা একদিন বা দুইটি অর্দ্ধদিন হিসাবে বৎসরে ৪৪ সপ্তাহের জন্য। কোন কোন ক্ষেত্রে এই উপস্থিতি একই সঙ্গে ৮ সপ্তাহের জন্য অথবা দুইটি ভাগে ৪ সপ্তাহ করিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে। তবে সাধারণক্ষেত্রে বৎসরে ৩৩০ ঘণ্টা এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

এইরূপ শিক্ষার অধিকারী কেহ যদি এইরূপ বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হইতে না পারে এবং উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে অক্ষম হয় তবে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে

পিতা-মাতা যেরূপ শাস্তি পাইতে বাধ্য সেইরূপ শাস্তি পাইতে বাধ্য থাকিবে। এইরূপ শিক্ষার অধিকারীরা তাহাদের ঠিকানা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানাইতে বাধ্য থাকিবে।

আংশিক সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ শিক্ষালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য দায়িত্ব পিতা-মাতার উপর অর্পণ না করিয়া ঐরূপ শিক্ষার অধিকারী তরুণ-তরুণীদেব উপর অর্পিত হইল। অর্থাৎ উহাদিগকে বয়স্কদের সমান অধিকাব প্রদান করা হইল। অধিকন্তু এই অংশে নাগরিকদের শিক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করা হইল এবং যুবক-যুবতীদের যে একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করা উচিত এই নীতি গ্রহণ করা হইল। প্রত্যেক দেশেই শিক্ষার্থীদেব যৌবনকালে একটি সুস্থ পরিবেশে উপযুক্ত লোকেব সাহায্যে কাটান উচিত। অনেকে মনে করেন সমাজে এই বয়সে তরুণ-তরুণীরা খাপ খাওয়াইয়া লইতে যে অসুবিধা বোধ করে তাহার সমাধান এইভাবে সম্ভব হইতে পারে। এই দিক হইতে চিন্তা করিলে আইনটির এই ধারাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১০। বিদ্যালয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ (School Health Service)

বিদ্যালয়েব শিশুদের স্বাস্থ্যবক্ষার জন্য ১৯০৭ সালের আইনে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইবে, এবং কয়েকটি বিশেষ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে, তবে এই চিকিৎসাও একমাত্র এলিমেণ্টারী (elementary) স্কুলেব ছাত্রছাত্রীদের জন্য করা হইবে এবং সম্ভবক্ষেত্রে চিকিৎসার খরচ পিতামাতার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

১৯৪৪ সালের আইনে এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হইল। উক্ত আইনে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল যে কাউন্টী স্কুল বা কলেজের

ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত সময় অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে। ইহা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হইল। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের থাকিল। এই চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে হইবে এবং সাহায্য করিতে হইবে।

বেসরকারী স্কুলসমূহ ও বিদ্যালয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের সাহায্য গ্রহণের জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবে।

উপরের ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা করিলে এইরূপ দেখা যায় যে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আইনে দুই হইতে আঠার বৎসর বয়সের বালকবালিকাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসার সুযোগ থাকিবে। পূর্বের ১৯০৭ সালের আইনে যেরূপ ব্যবস্থা ছিল আলোচ্য আইনটিতে তাহা অপেক্ষা উন্নততর ব্যবস্থা করা হইল ইহাতে সন্দেহ নাই।

বিদ্যালয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে বিদ্যালয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগটি, যদিও ইহা শিক্ষাদপ্তর এবং স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়, ইংলণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অধীন।

১৯৪৮ সাল হইতে বিদ্যালয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগের শাখা হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলি এই বিভাগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনা খরচায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপক বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

১১। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য খাদ্য এবং দুধের ব্যবস্থা।

১৯০৬ সালে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য খাদ্য ও দুগ্ধের ব্যবস্থা

সম্পর্কে একটি আইন পাশ করা হইল। উহাতে বিদ্যালয়ে খাদ্য ও দুগ্ধের ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হইল। কিন্তু নানা কারণে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের পক্ষে এই ব্যবস্থার ব্যাপক সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৪ সালের আইনে বিদ্যালয়ে খাদ্য ও দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থার আরও প্রসার করা হইল। বিদ্যালয়ে খাদ্য ও দুগ্ধ সরবরাহ করা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। কিন্তু বিনা খরচায় এই খাদ্য ও দুগ্ধ সরবরাহ করা সম্ভব হইল না। তবে ১৯৪৬ সালের আগষ্ট হইতে 'পারিবারিক ভাতা আইন' চালু হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে বিনা খরচায় দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। আরও বেশি সংখ্যক ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলে বিদ্যালয়ে বিনা খরচায় খাদ্য প্রদান করাও সম্ভব হইবে।

১০। ছাত্রছাত্রীদের জন্য অন্যান্য সুযোগের ব্যবস্থা।

শিক্ষাকে জাতীয় জীবনে এক বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়া আলোচ্য শিক্ষা আইনটিতে ছাত্রছাত্রীদের আরও সুযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে তাহারা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে জ্ঞানার্জনের সাধনা করিতে পারে। প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) আইনের ৫০ ধারায় বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বোর্ডিং এর ব্যবস্থা ছাড়াও শিশু ও যুবক-যুবতীদের জন্য **পৃথক বোর্ডিং এর ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে।**

(খ) আইনটির ৫১ ধারায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য **উপযুক্ত পোষাকের ব্যবস্থা** করিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি কোন ছাত্র অথবা ছাত্রী পোষাকের স্বল্পতার জন্য বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার

পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে, তবে তাহাদের **উপযুক্ত পোষাকের ব্যবস্থা** করিবার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দেওয়া হইল। এই ধারার অন্য অংশে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ব্যায়াম করিবার উপযুক্ত পোষাক সরবরাহের জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে উপযুক্ত নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ইহাও দেখিতে হইবে যে স্থানীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা এবং আমোদ-প্রমোদের উপযুক্ত ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত হয়। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ মন্ত্রীর অনুমোদন অনুযায়ী বালক-বালিকাদের জন্য ছুটিতে ক্যাম্পের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, ব্যায়াম-কেন্দ্র, সন্তরণ ও স্নানের আয়োজন ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিজেরা করিবেন কিংবা অন্যদের করিবার জন্য সাহায্য করিবেন।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন, এবং অন্যান্য নানা প্রকারের কাযের ব্যবস্থাও করিবেন এবং এই সংক্রান্ত ব্যয় মঞ্জুরও করিবেন।

(ঘ) আইনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য **বিনা খরচায় যানবাহনের** ব্যবস্থা করিবার ভার থাকিল স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর। এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব না হইলে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাড়া প্রদানের ব্যবস্থাও থাকিল।

(ঙ) যে সমস্ত শিশু শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা বশতঃ সাধারণ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত হয় নাই তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে পরীক্ষা করিবার পর উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে—ইহাও আইনটির অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

(চ) **অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের কর্মে নিয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থা।**

১৯৩৩ সালে এবং ১৯৩৮ সালে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের কর্মে নিয়োগ সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল বর্তমান আইন-টিতেও তাহা বজায় রাখা হইল। শুধু বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় পরিত্যাগের বয়স বৃদ্ধির জন্য উক্ত আইনসমূহে যেরূপ পরিবর্তন প্রয়োজন বোধ করা হইল সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইল।

(ছ) **শারীরিক ও মানসিক ত্রুটিসম্পন্ন শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা**

ক্লৈব্যগ্রস্থ শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থাও ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে করা হইল। তবে যাহারা সামান্য ত্রুটিযুক্ত তাহাদের শিক্ষা সাধারণ স্কুলেই হইবে এবং অত্যধিক বিকলমনাদের জন্য স্পেশাল স্কুলের ব্যবস্থা করা হইবে।

১১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেতন সম্পর্কে
(Fees in Secondary Schools)

বর্তমানে প্রত্যেক সভ্যদেশেই শিক্ষালাভের অধিকার জন-সাধারণের মূল অধিকারের অন্তর্ভূক্ত করা হইতেছে। এইজন্য প্রত্যেক সভ্যদেশেই শিক্ষাকে সকল স্তরেই অবৈতনিক করা হইতেছে। কারণ দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে যোগ্য শিক্ষিত নাগরিকদের উপর। এই বিষয়টি আমাদের দেশে তেমন উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

ইংলণ্ডের ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ পরিচালিত স্কুল ও কলেজ সমূহে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক করা হইল। কিন্তু সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লইবার অধিকার থাকিল।

সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষা অবৈতনিক করিবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিলেন। তাহারা এই মত প্রকাশ করিলেন যে এই

সকল বিদ্যালয় বেতন দাবী করিলে ইহারা জনসাধারণের নিকট উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং ইহাদের মান ও মর্যাদাও সকলে বেশি বলিয়া মনে করিবেন।

ইহাতে তৎকালীন শিক্ষাবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ বাটলার মন্তব্য করিলেন যে একমাত্র শিক্ষার সাহায্যেই আমাদের দেশে সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। সমাজের বাস্তব অবস্থা যেমন বিদ্যমান তাহা মানিয়া লইয়া তবে আমাদের কায করিতে হইবে। ইংলণ্ডের সমাজ ব্যবস্থার একটি বিশেষ ধারা মানিয়া লইয়া আমরা এই আইন পাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেটি হইতেছে যে এই দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় বর্তমান আছে এবং থাকিবে। সুতরাং এই প্রকারের বিদ্যালয়ও আমরা মানিয়া লইব যেখানে শিশুর পিতামাতা শিশুর লেখাপড়ার জন্য অর্থব্যয় করিতে ইচ্ছা করিলে সেইরূপ সুযোগ পাইবেন।

উপরে উল্লিখিত অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য আমাদের দেশের শিক্ষার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। কারণ আমাদের দেশে এখনও প্রাথমিক শিক্ষাই সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক করা সম্ভব হয় নাই। এই কলিকাতা সহরেই দেখিতেছি বিভিন্ন প্রকারের প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমান এবং তাহাদের মর্যাদা নির্ভর করে তথায় শিক্ষার জন্য ছাত্রদের নিকট হইতে যে হারে বেতন দাবী করা হয় তাহার উপর। এই জন্য কর্পোরেশনের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় অপেক্ষা যে সমস্ত বিদ্যালয়ে বেতন দাবী করা হয় তথায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পিতামাতারা নিজেদের সন্তানদের প্রেরণ করিতে পছন্দ করেন। আবার উচ্চতর আর্থিক সঙ্গতি-বিশিষ্ট পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মিশনারী পরিচালিত বা অনুরূপ বিদ্যালয়ে যেখানে বেতনের হার অত্যন্ত বেশি,

পাঠানো হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের গণতন্ত্র যেমন বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায়ে রচিত, ভারতবর্ষেও মনে হয় তেমনি বিভিন্ন শ্রেণী সমন্বিত সমাজ রচনার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্র এইরূপ বৈষম্যের মধ্যে চালু করা সম্ভব নহে। ইহা প্রবর্তন করিতে হইলে বিদ্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে এমন একটি পরিবেশের মধ্যে রাখিতে হইবে যেখানে সামাজিক শ্রেণী-চেতনা তাহাদের মনকে বিষাক্ত করিতে না পারে। এইজন্য প্রথমেই প্রয়োজন একই প্রকারের সুযোগ-বিশিষ্ট বিভিন্ন বিদ্যালয়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে একই ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

১২। স্বাধীন বেসরকারী বিদ্যালয় সম্পর্কে (Independent Schools)

ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীন বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি গণতন্ত্রের পক্ষে বাধাস্বরূপ বলিয়া অনেকে মনে করেন। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে এই বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হইল। যে সকল পাব্লিক-স্কুল সরকার বা স্থানীয় শিক্ষা কমিটী-গুলি হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ করিত না তাহাদের কার্যকলাপ পরিদর্শনের কোনরূপ ব্যবস্থা পূর্ববর্তী আইনসমূহে ছিল না। একমাত্র যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষ এইরূপ পরিদর্শনের জন্য আবেদন করিতেন সেই বিদ্যালয়গুলিকেই শিক্ষাবোর্ডের পরিদর্শকেরা পরিদর্শন করিতে পারিতেন।

ইংলণ্ডের বিভিন্ন পাবলিক স্কুল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মালিকানা বিদ্যালয় (Proprietary School) নিজেদের ইচ্ছামত কাজকর্ম চালাইত। ইহার মধ্যে বহু নিকৃষ্ট ধরণের বিদ্যালয়ও ছিল যাহার পরিচালক বা শিক্ষকদের কোনরূপ যোগ্যতা ছিল না।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে ইহাদের সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে প্রত্যেক স্কুলের নাম শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে রেজিষ্ট্রী করা হইবে এবং এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শনের অধিকারও শিক্ষাদপ্তরের থাকিবে। এই উদ্দেশ্যে একজন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করা হইবে।

বেসরকারী বিদ্যালয়ের মালিকেরা এই রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য আবেদন করিবেন এবং পরিদর্শনেব পর যদি ঐ সমস্ত বিদ্যালয়কে উপযুক্ত মনে করা হয় তবেই তাহাদিগকে রেজিষ্ট্রী করা হইবে। শিক্ষামন্ত্রী মনে করিলে কোন বিদ্যালযকে এইরূপ পরিদর্শন ব্যবস্থার বাহিরেও রাখিতে পারেন।

অনেকে মনে করেন পরিদর্শন সম্পর্কে শেষের ব্যবস্থাটি একদেশ-দর্শী ও অন্যায়। কারণ ইহাব দ্বারা কোন কোন বিশেষ বিদ্যালয়কে পরিদর্শন না করাইবার সুযোগ দেওয়া হইল।

চারিটী প্রধান কারণে কোন বিদ্যালয়কে তালিকা (register) হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পাবে। (১) যদি বিদ্যালয়গৃহ শিক্ষাদানের অনুপযুক্ত হয়। (২) যদি বিদ্যালয়গৃহে উপযুক্ত স্থান (accommodation) না থাকে। (৩) শিক্ষাপ্রদানেব ব্যবস্থায় যদি ত্রুটি থাকে, এবং (৪) যদি বিদ্যালয়ের পরিচালক এবং শিক্ষকবৃন্দ অনুপযুক্ত হন।

তবে উপরের অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপীল করিতে পারিবেন।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনের যে অংশে এই ধারাগুলি বর্ণিত হইয়াছে তাহা আইনটির 'তৃতীয় অংশ' নামে উল্লিখিত। আইনটির তৃতীয় অংশের বা Part III এর ধারাগুলি চালু করা সম্পর্কে বলা হইল যে কাউন্সিলের আদেশ অনুযায়ী কোন একটি নির্দিষ্ট দিন হইতে চালু করা হইবে।

আইনে বর্ণিত তৃতীয় অংশটি চালু হইবার ছয় মাসের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি রেজিষ্ট্রী না করিয়া কোন বিদ্যালয় চালায় অথবা কোন ব্যক্তি পূর্বে শিক্ষকতা কার্যে অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পরেও কোন বিদ্যালয়ে চাকুরী গ্রহণ করে অথবা চাকুরীর জন্য চেষ্টা করে তবে উহারা শাস্তি পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এইরূপ অপরাধের জন্য ২০ পাউণ্ড হইতে ৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত জরিমানা অথবা জেল, অথবা উভয় প্রকারের শাস্তি ভোগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অযোগ্য ঘোষিত কোন ব্যক্তি শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এই বাধা অপসারণের জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং তাহার আবেদন অগ্রাহ্য হইলে বেসরকারী স্বাধীন বিদ্যালয় সম্পর্কিত ট্রাইবুনালের নিকট পুনরায় আপিল করিতে পারিবে।

আইনটির চতুর্থ অংশে সাধারণ শাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

১৩। পরিদর্শক নিয়োগ

বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য যে পরিদর্শকমণ্ডলী নিয়োগ করা হইবে তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিবেন। ইহাদের চাকুরী সরকারী চাকুরী (His Majesty's Inspectors) বলিয়া গণ্য হইবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের অধীনে ইহারা কার্য করিবেন। ইহাদের নিয়োগের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর সমর্থন থাকিবে। তবে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ স্ব স্ব এলাকার জন্য স্থানীয় পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

সরকারী পরিদর্শকগণ অথবা শিক্ষামন্ত্রী বা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কেহই ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে কোনরূপ তদন্ত করিতে পারিবেন না।

বেসরকারী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বাধ্যতামূলক বয়সের বালক-বালিকাদের নামের যে তালিকা (register) রাখিবেন তাহাও উপযুক্ত পরিদর্শকদের তদন্তাধীন হইবে।

১৪। শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণা। (Research)

আইনে শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণার জন্য অর্থব্যয়ের ক্ষমতাও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হইল। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার জন্য বিবিধ সভা ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে ছাড়াও শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা, শিক্ষার অন্যান্য গবেষণা বা শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন।

১৫। আর্থিক ব্যবস্থা (Financial Provisions)

ইংলণ্ড শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করিয়া থাকে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াও কি ভাবে শিক্ষার মান সমান রাখা যায় এবং ধীরে ধীরে উন্নত করা যায় ইংলণ্ড তাহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট শিক্ষা পরিচালনার ভার থাকিলে প্রধান অসুবিধা এই হয় যে দেশের প্রত্যেক অংশে শিক্ষার মান ও সুযোগ সমান রাখা সম্ভব হয় না। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির আয় বিভিন্ন হয় এবং খরচের প্রয়োজনও বিভিন্ন হইতে পারে। কোন বিশেষ অঞ্চলের আয় বেশি এবং খরচ কম হইতে পারে, আবার কোথায়ও খরচ বেশি এবং আয় কম হইতে পারে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আইনে কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকিলেও ১৯৪৮ সালে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল যাহাতে দুর্বল 'স্থানিক'-গুলি শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করিবার জন্য কোনও

অসুবিধা বোধ না করে। এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৮ সালে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলির মোট প্রয়োজনের প্রায় শতকরা ৬৪ ভাগ কেন্দ্রীয় বাজেট হইতে বরাদ্দ করা হইয়াছে।

স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলিকে নিম্নলিখিত 'সূত্র' অনুযায়ী সাহায্য প্রদানেব ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(ক) সমস্ত শ্রেণীব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের গড় সংখ্যা হিসাব কবিয়া ছাত্রছাত্রী প্রতি ১২০ শিলিং হাবে অনুদান (grant) দেওয়া হইবে।

(খ) তবে এই অর্থেব সহিত 'স্থানিক'-গুলি কর্তৃক মোট ব্যয়েব শতকবা ৬০ ভাগ যোগ কবা হইবে, এবং

(গ) স্থানীয় এলাকাব মোট যত পাউণ্ড ট্যাক্স আদায় হইবে সেই অনুযায়ী প্রতি পাউণ্ডে ৩০ পেন্স হিসাব কবিয়া মোট অনুদান হইতে বাদ দেওযা হইবে।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী দবিদ্র 'স্থানিক'-গুলি বেশি কবিয়া আর্থিক সাহায্য পাইল এবং ফলে দেশের সর্ব্বত্র শিক্ষার মান ও সুযোগ সমান করা সম্ভব হইল।

স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষগুলিকে সাহায্য কবা ছাডা শিক্ষামন্ত্রী নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য কবিতে পাবিবেন।

(ক) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যাহাবা শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজ বা গবেষণা কবিতে চাহে।

(খ) ছাত্রছাত্রীদেব উপযুক্ত বত্তি, সাহায্য, বিদ্যালয়েব মাহিনা প্রভৃতির জন্য।

শিক্ষা আইনের সমালোচনা

আমরা ১৯৪৪ সালের ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনেব বিভিন্ন ধারা

আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে ইহা ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু আইনটিতে কিছু কিছু ত্রুটি বর্তমান আছে বলিয়া মনে হয়। কোন শিক্ষা আইনকে গভীর ভাবে বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে ইহা কতখানি দেশের শিশু, তরুণ-তরুণী এবং জনসাধারণের দাবী মানিয়া লইয়াছে। আবার ইহাতে দেখিতে হইবে যে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে দেশের গভর্ণমেণ্ট কতখানি অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রথমেই আমরা আলোচনা করিব আইনটিতে দেশের শিশুদের শিক্ষার অধিকার কতখানি মানা হইয়াছে।

প্রত্যেক সভ্য দেশেই শিশুদের শিক্ষার দাবী শিশুদের জন্মগত অধিকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিশুর জন্য বিনা বেতনে উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্বের অন্তর্গত। বর্তমানে অধিকাংশ অগ্রসর দেশে শুধু মাত্র প্রাথমিক শিক্ষাই নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাও সর্বসাধারণের জন্য অবৈতনিক করা হইতেছে। কারণ একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারাই দেশের প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা করা যাইতে পারে।

এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয় ১৯৪৪ সালের ইলংণ্ডের শিক্ষা আইনে ইংলণ্ডের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খার অনেক কিছুই পুরণের চেষ্টা করা হইয়াছে।

আইনটিতে শিশুর অধিকার সম্পর্কে বলা হইয়াছে,—

দেশের ৫ হইতে ১৫ বৎসরের সমস্ত বালক-বালিকাদের বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে এবং কোন পিতামাতা শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে কর্তব্য পালনে অনিচ্ছুক হইলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষার অন্তর্গত বয়সের শিশুদের কোনরূপ কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে না। শিক্ষা বলিতে কেবলমাত্র লেখাপড়াই বুঝাইবে না, শিশুর শারীরিক উন্নতির ও মানসিক আনন্দের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। এই জন্য বিদ্যালয়ে ব্যায়াম, খেলাধূলা এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা রাখা হইবে। বালক-বালিকাদের আত্ম-শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ছুটির সময়ে ক্যাম্প, নূতন স্থানে অভি-যান, প্রতিযোগিতামূলক খেল, সন্তরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা খরচে দুগ্ধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য মধ্যাহ্নের আহারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে। ভবিষ্যতে সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই আহারের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য পোষাকের ব্যবস্থা করা না হইলেও, যদি কোন ছাত্রছাত্রী দারিদ্র্যের জন্য উপযুক্ত পোষাকের অভাবে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্তব্যকার্যে উপস্থিত হইতে না পারে, তবে তাহাদের জন্য পোষাকের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বাধ্যতামূলক বয়সের সীমা অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের ১৮ বৎসর পর্যন্ত হয় পূর্ণ সময়ের জন্য অথবা আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে।

স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহে **মধ্যশিক্ষা অবৈতনিক** করা হইয়াছে। যদি কোন ছাত্রছাত্রী বিশেষ কারণে কোন বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য হয় তবে তাহার শিক্ষার ব্যয় স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ প্রদান করিবে।

ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য বিনা খরচে যানবাহনের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা করা সম্ভব না হইলে ঐ ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য খরচ স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ প্রদান করিবেন।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষামন্ত্রী অথবা স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বৃত্তি বা সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বোর্ডিংএর ব্যবস্থা করিতে হইবে। শারীরিক ও মানসিক অপূর্ণ শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিবেন।

১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে শিশুদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার জন্য স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিবেন। শিশুদের অধিকার সম্পর্কে ইহা একটি বিশেষ ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। তবে এই সম্পর্কে প্রধান ত্রুটি এই যে সমস্ত শ্রেণীর শিশুদের জন্য একই প্রকারের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারী প্রচেষ্টার যথেষ্ট স্থান রাখা হইয়াছে। ইহার ফলে সঙ্গতিপন্ন পরিবারের শিশুরা যেরূপ শিক্ষার সুযোগ পাইবে, সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা সেইরূপ পাইবে না। প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে এই নীতি গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

জনসাধারণ ও পিতামাতার অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় ইংলণ্ডে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের শিক্ষা পরিচালনার যেমন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের স্থান আছে, তেমনি স্থান আছে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষসমূহের। এই স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংগঠনে স্থানীয় উপযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচিত হইবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছাড়া প্রত্যেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পরিচালন-কমিটীতে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

পিতামাতাদের অধিকার সম্পর্কে আইনে বহু ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক পিতামাতা তাহাদের পুত্রকন্যাকে ইচ্ছামত

শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিবেন। প্রাথমিক ও কোন কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কোন বেতন প্রদান করিতে হইবে না। তবে স্থানীয় কমিটী শিক্ষাকরের মারফৎ জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

পিতামাতার কর্তব্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে পিতামাতাকে তাহাদের ৫ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক শিশুদের অবশ্যই শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন পিতামাতা যদি এই ব্যাপারে অবহেলা করেন তবে আইন অনুযায়ী তিনি জরিমানা বা জেল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উভয় প্রকারের শাস্তির অধিকারী হইবেন। অর্থাৎ কোন পিতামাতা যদি তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হন তবে রাষ্ট্র তাহাদিগকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করিতে পারিবে।

শিক্ষকদের অধিকার এবং চাকুরীর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সম্পর্কে আইনে কয়েকটি ধারায় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। শিক্ষকদের কর্মে নিয়োগ এবং বরখাস্ত সম্পর্কে নিয়মাবলী আরও স্পষ্টভাবে আইনে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের নিযুক্ত করিবেন, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা ঐ সকল বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটীর হাতে রাখা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষকদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবার অধিকার একমাত্র স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের হাতেই রাখা হইয়াছে। আইনে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার জন্য বার্ণাম কমিটীকে এই সম্পর্কে তদন্ত করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ তদন্ত অনুযায়ী বেতন বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করিতে বলা হইয়াছে। বার্ণাম কমিটীতে শিক্ষকদের ও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি থাকিবে। বর্তমান আইনে বার্ণাম কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত স্থানীয় শিক্ষা-

কর্তৃপক্ষকে স্ব স্ব এলাকার শিক্ষকদের বেতনের হার একইরূপ করিতে বলা হইয়াছে। পূর্বে এই ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষকদের কর্মে নিয়োগের সময় 'নিয়োগ পত্র' প্রদান করিতে হইবে এবং ঐ নিয়োগ পত্রে শিক্ষকদের কর্তব্য কর্মের উল্লেখ থাকিবে। উহার বাহিরে কিছু করিতে তাহারা বাধ্য থাকিবেন না।

বিবাহিতা মহিলাদের শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত করিবার বিরুদ্ধে যে নিয়ম ছিল বর্তমান আইনে তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে একটি বিষয়ে বিশেষ ত্রুটি রাখা হইয়াছে। একই কার্যে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিকাদের বেতন শিক্ষকদের অপেক্ষা কম রাখা হইয়াছে।

বেসরকারী বিদ্যালয়ে উচ্চতর পদে কর্মে উন্নতি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সম্পর্কে প্রার্থীর ধর্ম বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব প্রদান করিবার পূর্বের নিয়মও লোপ করা হইয়াছে।

পূর্বের অপেক্ষা বর্তমান আইনে শিক্ষকদের বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইলেও, শিক্ষকদের দাবী অনুযায়ী আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব শিক্ষা আইনটির মারফৎ কি ভাবে পালন করা হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে শিক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানীয় নির্বাচিত শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দাবীও বহুলাংশে মানা হইয়াছে। সরকারী শিক্ষা-দপ্তরকে সামঞ্জস্য বিধায়ক সংস্থা (Co-ordinating body) বলা যাইতে পারে এবং শিক্ষার পরিচালনা এবং ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ ভার অর্পিত হইয়াছে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর। শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট ও স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের ভিতর ক্ষমতা ভাগাভাগি করা হইয়াছে এবং অংশীদার হিসাবে স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের প্রাধান্য

বেশি মানা হইয়াছে। তবে শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে শিক্ষা-দপ্তরের দায়িত্ব বেশি রহিয়াছে। ইংলণ্ডের সমাজ জীবনে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রাধান্য এত বেশি যে শিক্ষা পরিচালনা ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শাসনের প্রাধান্য জনসাধারণ মানিতে পারে না। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত গভর্ণমেণ্টও যাহা করিবেন, তাহা জনসাধারণকে মুখ বুঝিয়া মানিয়া লইতে হইবে এই নীতি কোন প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশ মানিয়া লইতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অর্থ এই যে দেশের শাসন ব্যবস্থা ও কর্তৃত্বের প্রতি স্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় থাকিবে। ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিক নীতিই বজায় রাখা হইয়াছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান ত্রুটি এই যে এই ব্যবস্থায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আর্থিক সংগতির তারতম্য অনুসারে শিক্ষার মান একই রকম রাখা সম্ভব হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে থাকাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার মানের বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম স্থির করা হইয়াছে। এই নীতি নানাকারণে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু ইংলণ্ডে দেখিতেছি শিক্ষার কর্তৃত্বের ভার স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হইলেও, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অনুদান (Grant) সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তাহার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অংশে একই প্রকারের শিক্ষার মান বজায় রাখা সম্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ডের নিকট হইতে এই ব্যাপারে আমাদের অনেক বিষয় শিক্ষা করিবার আছে।

শিক্ষা পরিচালনা ব্যাপারে স্থানীয় দায়িত্ব মানিয়া লইলেও, জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে

রাখা হইয়াছে। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে তাহার জন্য আইনে ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভিতর মত বিরোধের ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালের হস্তে বিচারের ভার দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

আইনটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, এই আইনের সাহায্যেই প্রথমে ইংলণ্ডের বেসরকারী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন স্বীকার করা হইয়াছে। এ যাবৎকাল ইংলণ্ডের 'পাবলিক স্কুল' সমূহ এবং অন্যান্য বেসরকারী বিদ্যালয় ইংলণ্ডের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভূত ছিল না। ১৯৪৪ সালে শিক্ষা আইনের মারফৎ সরকারী ইন্স্পেক্টরগণ ঐ সকল বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের আদেশ পাইলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় বন্ধ করিবার এবং অনুপযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকারী হইলেন। বেসবকারী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে ফি আদায়ের অধিকার থাকিল। ইংলণ্ডের লেবার পার্টি (Labour Party) অবশ্য এই ব্যবস্থায় খুসি হইতে পাবিলেন না। কিন্তু তদানীন্তন শিক্ষাবোর্ডের সভাপতি মিঃ বাটলার বলিলেন যে নূতন আইনে আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছি এবং শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে আমরা পিতামাতার এই অধিকারও মানিয়া লইয়াছি যে তাহারা তাহাদের পছন্দমত বিদ্যালয়ে তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারিবেন। সুতরাং এই সমস্ত বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন কথাই উঠে না।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫২—'৫৩)

মুদালিয়র কমিশন

মধ্যশিক্ষা কমিশন গঠন, মধ্যশিক্ষাব লক্ষ্য, শিক্ষার নবরূপ, বিদ্যালয়েব বিভিন্ন ধরণ,—মধ্য-বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, কাবিগরী বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয়, পাবলিক স্কুল, আবাসিক বিদ্যালয়, আবাসিক দিবা বিদ্যালয়, বিশেষ বিদ্যালয়, আংশিক সময়ের বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, পাঠ্যবিষয় ও ভাষা, পাঠ্যক্রম, ভাষা সমস্যা, নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি, পরীক্ষা সংস্কার, সংগঠন ও শাসন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, শিক্ষণ-শিক্ষা বোর্ড, আথিক ব্যবস্থা, কারিগরী শিক্ষাকর, বেসরকারী দান ও ধর্মার্থ প্রদত্ত অর্থ ও সম্পত্তি, অন্যান্য ব্যবস্থা, মধ্যশিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রের দায়িত্ব, শিক্ষকদের সম্পর্কে ব্যবস্থা, ত্রিবিধ সাহায্য ব্যবস্থা, সমালোচনা।

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত গভর্ণমেণ্ট এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন এবং উহার উপর মধ্যশিক্ষার নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং সুপারিশ করিবার ভার অর্পণ করেন। মধ্যশিক্ষা ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রের এক উল্লেখ-যোগ্য অংশ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এযাবৎকাল বিদেশী শাসনকালে উহা এইরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছিল যে উহার দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। অবশ্য আলোচ্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের পূর্বে অনুরূপ কয়েকটি কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। ঐ সমস্ত রিপোর্টেও অনেক মূল্যবান সুপারিশ করা হইয়াছিল। তাহার কিছু কিছু তদানীন্তন গভর্ণমেণ্ট মানিয়া লইলেও আর্থিক কারণে ঐগুলি পুরাপুরি চালু করা সম্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়া দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার এক নূতন পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। এই নূতন পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজন বিশেষ করিয়া অনুভূত হইল। ১৯৫২ সালের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিশ্চয়ই ঐ পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার ফল। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের পূর্বে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৯) গঠিত হইয়াছিল। ঐ কমিশন রাধাকৃষ্ণণ্ কমিশন নামেও খ্যাত (কারণ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্ ঐ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন)। ঐ কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ দুইটি শ্রেণীর শিক্ষার উন্নতির জন্য কিছু সুপারিশ করিলেও সামগ্রিকভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কোনরূপ আলোচনা করেন নাই। সুতরাং স্বাভাবিক কারণে নূতন একটি কমিশন দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্য গঠন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইল।

দেশের ও বিদেশের নয় জন শিক্ষাবিদকে লইয়া ১৯৫২ সালের ভারতীয় মধ্যশিক্ষা কমিশন গঠিত হইল মধ্যশিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ের উন্নতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করিবার জন্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। ভারতবর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য উপযুক্ত সুপারিশযুক্ত অনুরূপ বিবরণ পূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ চিত্রও ঐ রিপোর্টে পাওয়া যায়।

আলোচ্য রিপোর্টটি ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রিপোর্টটির **প্রথম অধ্যায়ে** কমিশন গঠনের কারণ এবং এবং আলোচ্য বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** আলোচিত হইয়াছে বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ এবং ঐতিহাসিক ধারা সম্পর্কে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** আলোচিত হইয়াছে মধ্যশিক্ষাব বর্তমান ত্রুটি এবং গণতান্ত্রিক ভারতে মধ্যশিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে। **চতুর্থ অধ্যায়ে** কমিশন প্রস্তাবিত মধ্যশিক্ষার নূতন রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। **পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে** মধ্যশিক্ষার ভাষা সমস্যা এবং পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। **সপ্তম অধ্যায়ে** আলোচিত হইয়াছে আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে। **অষ্টম হইতে একাদশ অধ্যায়ে** মধ্যশিক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় যেমন,—শৃঙ্খলা রক্ষা (discipline) ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, পাঠ্য-বিষয় বহির্ভূত কর্ম, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে পরামর্শ দান (Guidance and Counselling), ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যবস্থা, এবং পরীক্ষা সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। **দ্বাদশ অধ্যায়ে** শিক্ষক সমস্যা,

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মধ্যশিক্ষা সংগঠন ও পরিচালনা, **চতুর্দশ অধ্যায়ে** অর্থসমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। **পঞ্চদশ অধ্যায়ে** কমিশনের প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়েব ভবিষ্যৎ রূপ কিরূপ হইবে তৎসম্পর্কে আলোচনা আছে এবং **পরবর্তী অধ্যায়ে** আলোচনাব 'উপসংহাব' সংযোজিত করা হইযাছে।

কমিশনের রিপোর্টটিব সম্পূর্ণ আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এইজন্য উহার প্রধান প্রধান সুপারিশগুলিই মাত্র আলোচনা করা হইল।

১। মধ্যশিক্ষার লক্ষ্য (Aims and Objectives)

কমিশন ভারতবর্ষেব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাব প্রয়োজনের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া মধ্যশিক্ষাব কয়েকটি লক্ষ্য নির্ধারণ করিয়াছেন। মধ্যশিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চতর শিক্ষার মধ্যবর্তী অংশ হিসাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থারূপে পবিগণিত হইবে। এই শিক্ষা হইবে ১১ হইতে ১৭।১৮ বৎসব বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা। ইহাব লক্ষ্য হইবে ভারতবর্ষের নূতন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতীয় তরুণ-তরুণীদের **দৃঢ় চরিত্র সৃষ্টির (training of character)** উপযোগী শিক্ষা প্রদান কবা, যাহাতে তাহাবা ভবিষ্যতে সমাজ জীবনে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই শিক্ষার সাহায্যে তাহারা তাহাদের **জীবিকা অর্জনের উপযোগী যোগ্যতা অর্জন (Vocational efficiency)** করিতে পারিবে এবং এই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধশালী ভারত গঠনে তাহারা আপনাদের নিযুক্ত করিতে পারিবে। উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব (**Personality**) সৃষ্টি হইবে এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য এবং ইহার সাহায্যে তাহারা তাহাদের সাহিত্য,

সংস্কৃতি ও শিল্প সংক্রান্ত যোগ্যতা ও রুচি বর্দ্ধিত করিতে পারিবে এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন (Cultural) নাগরিক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

২। মধ্য শিক্ষার নব রূপ

(New Pattern of Secondary Education)

কমিশনের রিপোর্টে মধ্য-শিক্ষার স্থায়িত্ব কাল ধরা হইয়াছে **সাত বৎসর** অর্থাৎ ১১ হইতে ১৭ বৎসরের বালক-বালিকারা এই শিক্ষা লাভ করিবে। কিন্তু আমাদের সংবিধানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স নির্ধারিত হইয়াছে ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত। এই কারণে বাধ্যতামূলক শিক্ষার শেষ অংশ মধ্য-শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

দেশের সর্বাঙ্গীন শিক্ষা পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিয়া কমিশন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্ত নিম্নলিখিত পরিকল্পনা প্রদান করেন।

প্রাথমিক অথবা নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা,—ইহার শিক্ষার কাল হইবে চার অথবা পাঁচ বৎসর। ইহার পর মধ্যশিক্ষা আরম্ভ হইবে। মধ্য-শিক্ষা নিম্নলিখিত কয়েকটি স্তরে বিভক্ত হইবে।

(১) মধ্য বিত্থালয় (Middle School) বা, নিম্ন মাধ্যমিক বিত্থালয় (Junior Secondary) বা উচ্চ বুনিয়াদী বিত্থালয় (Senior Basic School) এর শিক্ষা। ইহার শিক্ষার কাল হইবে তিন বৎসর।

(২) উচ্চ মাধ্যমিক বিত্থালয় (Higher Secondary School); ইহার শিক্ষার কাল হইবে চার বৎসর।

[**মন্তব্য :** উপরের হিসাব অনুযায়ী কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিত্থালয়ের মোট শিক্ষাকাল ১২ বৎসর নির্ধারণ করিয়াছেন।]

উপরে যে শিক্ষার তিনটি স্তরের উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ

প্রাথমিক শিক্ষা, নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা—ইহাদিগকে একই সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাব পরস্পর সংযুক্ত উচ্চতর ধাপ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহারা কোন বিচ্ছিন্ন অংশ নহে। দেশে ভবিষ্যতে যখন ৮ বৎসরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে তখন এইরূপ পবস্পর সংযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান থাকিলে শিক্ষা পবিচালনায় কোনরূপ অসুবিধাব সম্মুখীন হইতে হইবে না।

কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাব যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাকে স্বীকার করিযা লইয়া এই নব ধাবাব প্রবর্তন কবিতে হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালযগুলিব বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের পক্ষে এইরূপ দায়িত্ব লওয়া সম্ভব হইবে না। এই জন্য মধ্যবর্তী সময়ের জন্য পুরাতন ও নূতন উভয় শ্রেণীব বিদ্যালয় বর্তমান থাকিবে।

বর্তমানেব মাধ্যমিক কলেজগুলি (Intermediate Colleges) সম্পর্কে কমিশনেব মত এই যে তাহাবা তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই নূতন ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদেব খাপ খাওয়াইযা লইতে চেষ্টা কবিবে। তবে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহাদেব কোন স্থান থাকিবে না। তিন বৎসরেব ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন কবিযা ইহাদেব নূতন ডিগ্রী কলেজে পবিণত কবা যাইতে পাবে অথবা ইহাদেব চাবি শ্রেণী বিশিষ্ট উচ্চতব মধ্য বিদ্যালয়ে পবিবর্তিত করা যাইতে পাবে। দশ শ্রেণী বিশিষ্ট বিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে সমস্ত ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত কবিয়া ডিগ্রী শ্রেণীতে ভর্তি হইতে চাহিবে তাহাদেব অতিবিক্ত এক বৎসরেব জন্য প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ করিয়া ডিগ্রী শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত হইতে হইবে।

৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরণ (Types)

কমিশনের মতে মধ্যশিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে এবং শিক্ষার্থীর

যোগ্যতা এবং রুচি অনুযায়ী উহা প্রদান করিতে হইবে। সুতরাং মধ্যশিক্ষার শেষের দিকে বিভিন্ন প্রকারের পাঠ্য বিষয়ের (diversified courses) ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমান মধ্য-বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্বও কিছুদিন পর্যন্ত বজায় থাকিবে। সুতরাং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মধ্যশিক্ষা পুনর্গঠন করা হইলে বর্তমানের বিদ্যালয়গুলি ছাড়া আরও কয়েক প্রকারের মধ্যশিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।

কমিশন মধ্যশিক্ষার উপযোগী নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

(১) **মধ্য বিদ্যালয় (Middle School) অথবা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Junior Secondary School)**

এইরূপ বিদ্যালয়ে তিনটি শ্রেণী থাকিবে, সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার পরে তিন বৎসরে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করা যাইবে।

(২) **উচ্চ বিদ্যালয় (High School)**

বর্তমানের দশ শ্রেণী বিশিষ্ট বিদ্যালয়সমূহ এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) **উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Higher Sec. School)**

এইরূপ বিদ্যালয়ের পাঠের কাল হইবে চারি বৎসর। বর্তমানের মধ্যশিক্ষার কলেজগুলি ধীরে ধীরে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিতে হইবে। বর্তমান ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার এক বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভিতর আসিবে এবং অন্য এক বৎসর যোগ হইবে তিন বৎসরের ডিগ্রী কলেজগুলির সহিত।

(৪) **বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় (Multipurpose School)**

যে সমস্ত অঞ্চলে সুযোগ পাওয়া যাইবে সেই সকল অঞ্চলে বহুমুখী বা সর্বার্থসাধক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ

বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে বিভিন্ন ছাত্রদের রুচি, ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৫) কারিগরী বিদ্যালয় (Technical School)

ব্যাপক কারিগরী শিক্ষা আমাদের দেশের সার্থক শিল্পায়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এইজন্য দেশের বিভিন্ন অংশে বহু কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন হইবে। এই বিদ্যালয় পৃথকভাবে অথবা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের অংশ হিসাবে স্থাপন করিতে হইবে। দেশের শিল্প-সমৃদ্ধ এলাকায় এই বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় নির্বাচনে আঞ্চলিক শিল্পের প্রয়োজনের কথা সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সম্ভবক্ষেত্রে বিভিন্ন শিল্পের সহযোগিতা গ্রহণের চেষ্টা করিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষার উন্নতির জন্য বিভিন্ন শিল্পের উপর 'শিল্পশিক্ষা কর' (Industrial Education Cess) বসানো যাইতে পারে এবং এইরূপ ভাবে প্রাপ্ত অর্থ একমাত্র কারিগরী শিক্ষার জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) কৃষি বিদ্যালয় (Agricultural School)

প্রত্যেক রাজ্যে কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইরূপ বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করিতে হইবে এবং পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে কৃষি ছাড়া, উদ্যান নির্মাণ, পশুপালন এবং কুটির-শিল্প শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। এইরূপ বিদ্যালয় পৃথকভাবে অথবা গ্রামাঞ্চলের বহুমুখী বিদ্যালয়ের অংশ হিসাবে স্থাপন করিতে হইবে।

(৭) পাবলিক স্কুল (Public School)

বৃটিশ শাসন কালে ভারতবর্ষের পাবলিক স্কুলগুলি স্থাপিত হইয়াছিল ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের অনুকরণে রাজা মহারাজা এবং ধনিক

শ্রেণীর পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য। স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী সমাজ গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। এই অবস্থায় কোন এক বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ প্রকারের বিদ্যালয়ের যৌক্তিকতা কি—এই সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন। কমিশন তাহাদের রিপোর্টে দেশের বাস্তব অবস্থা মানিয়া লইয়া পাবলিক স্কুলগুলি বজায় রাখিবাব স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান কবিয়াছেন। তবে তাহারা এইরূপ মন্তব্যও করিয়াছেন যে এই স্কুলগুলিকে জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিতে হইবে এবং ইহাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ হিসাবে কার্য করিতে হইবে। ব্যয় নির্বাহের জন্য ইহাদেব স্বাবলম্বী হইতে হইবে এবং ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক ইহাদের যে সাহায্য প্রদান করা হয় তাহার পরিমাণ ধীরে ধীবে কমাইয়া আনিতে হইবে। এই সমস্ত স্কুলেব শিক্ষাপদ্ধতি ও ব্যবস্থা প্রচলিত বিদ্যালয়গুলি হইতে স্বতন্ত্র এবং উন্নততর হওয়ায় দেশের অল্পবিত্ত প্রতিভাশালী শিশুদের এই বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং এইজন্য উপযুক্ত সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

(৮) আবাসিক বিদ্যালয় (Residential School)

যে সমস্ত ব্যক্তি বদলীর চাকুরী করেন, বা সামরিক বিভাগ, বা বৈদেশিক বিভাগে চাকুরী করেন, তাহাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় বিশেষ প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলেই এই বিদ্যালয় স্থাপন কবা উচিত। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে দিবা বিদ্যালয় অপেক্ষা বেশি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা যায় এবং ছেলে-মেয়েদের এক আদর্শ পরিবেশে রাখিবার চেষ্টা করা যায়।

(৯) আবাসিক দিবা বিদ্যালয় (Residential Day School)

আবাসিক বিদ্যালয়ের বিকল্প হিসাবে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় ছেলে-

মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই ধরণের বিত্থালয় আমাদের দেশে নূতন। এইরূপ বিত্থালয়ে ছেলে-মেয়েরা সকালে ৮ টার সময় উপস্থিত হইবে এবং সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাটাইবে। বিত্থালয়ে আহাব ও জলখাবারের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যে সমস্ত অঞ্চলে পিতামাতাকে কাজের জন্য বাহিরে থাকিতে হয়, সেই সমস্ত স্থানে এইরূপ বিত্থালয় বিশেষ প্রয়োজন হইবে।

(১০) শারীরিক ও মানসিক ক্রটিসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় (Schools for the Handicapped)

শাবীরিক ও মানসিক ক্রটিসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদেব শিক্ষার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক বিদ্যালয় বিভিন্ন বাজ্যে স্থাপন করিতে হইবে।

(১১) আংশিক সময়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ·বিদ্যালয় (Part-time Continuation Classes)

যদিও আমাদেব শাসনতন্ত্রে উল্লেখ আছে যে দেশের ছেলে-মেয়েদেব চৌদ্দ বৎসব পযন্ত সম্পূর্ণ সময়ের শিক্ষা প্রদান কবিতে হইবে কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় ইহা ১১ বৎসব বয়স্ক ছেলে-মেয়ে-দেরই মাত্র দেওয়া যাহতে পাবে। এই অবস্থায় যে সকল বালক-বালিকা ১১ বৎসবেব পবে পড়া বন্ধ কবিতে বাধ্য হইবে তাহাদের জন্য আংশিক সময়েব শিক্ষাব ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ এই বয়সে (১১—১৪) ছেলে-মেয়েবা যদি উপযুক্ত পবিবেশে অতিবাহিত করিতে সুযোগ না পায় তবে নানারূপ বিপদের সৃষ্টি হইতে পারে। এই কাবণে প্রত্যেক অঞ্চলে ১১ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের আংশিক সময়েব শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মধ্য বিদ্যালয় বা উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যালয়ের কাজকর্মের পর অপরাহ্ণে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে। এই শিক্ষা অবৈ-তনিক হইবে এবং স্থানীয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(১২) বালিকা বিদ্যালয়

বালিকাদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বালিকাদের উপযুক্ত পাঠ্যবিষয় ইহাতে পড়াইবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। তবে দেশের বর্তমান অবস্থায় স্থানীয় কোনরূপ আপত্তি না হইলে বালকদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে বালিকাদেরও পড়াইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তবে বালিকাদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। পাঠ্যবিষয় ও ভাষা (Curriculum and languages)

পাঠ্যবিষয় ও ভাষা সম্পর্কে কমিশনের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যতে দুই প্রকারের মধ্য বিদ্যালয় প্রচলিত থাকিবে। বর্তমানের উচ্চ বিদ্যালয়গুলি ইহার মধ্যে ধরিলে মোট তিন প্রকারের বিদ্যালয় দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান থাকিবে।

এইগুলি হইবে **নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়** (Junior Secondary Schools), **উচ্চ বিদ্যালয়** (Higher Schools) এবং **উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়** (Higher Secondary Schools)

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ১১ হইতে ১৩ বৎসরের বালক-বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাকাল যথাক্রমে ৩ বৎসর ও ৪ বৎসর হইবে; এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৪ হইতে ১৬ বৎসরের বালক-বালিকা এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৪ হইতে ১৭ বৎসরের বালক-বালিকাগণ পাঠ গ্রহণ করিতে পারিবে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলি অবশ্য মধ্যবর্তী সময়ের জন্য বর্তমান থাকিবে।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিরই উচ্চতর ধাপ, এইজন্য উক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়সমূহও প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবে। এই স্তরে যে সমস্ত বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে শিক্ষার্থীকে মানব-সংস্কৃতি ও কর্মের বিভিন্ন ধারার সহিত পরিচয় করানো। সুতরাং এই সমস্ত বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১। ভাষা, ২। সামাজিক শিক্ষা, ৩। সাধারণ বিজ্ঞান, ৪। গণিত, ৫। কলা ও সঙ্গীত, ৬। শিল্প, এবং **৭। শরীরচর্চা।**

উচ্চ বিদ্যালয় বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর রুচি, যোগ্যতা ও প্রবণতা অনুযায়ী বহুমুখী বিষয়ের (diversified courses) ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে পাঠ্য বিষয়ের ভিতর কয়েকটি বিষয় হইবে 'মূল বিষয়' (core subjects) এবং কয়েকটি থাকিবে 'ঐচ্ছিক বিষয়' (optional subjects)। মূল বিষয়গুলি সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঐচ্ছিক বিষয়গুলি শিক্ষক, অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত কোন মনস্তাত্ত্বিকের সাহায্য লইয়া ছাত্রদের ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী নির্বাচিত করিতে হইবে।

কমিশন উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্যবিষয় নির্ধারিত করিয়াছেন।

মূল বিষয়

(ক) ভাষা

(১) মাতৃভাষা অথবা স্থানীয় ভাষা অথবা মাতৃভাষা ও প্রাচীন ভাষার সম্মিলিত বিষয়।

(২) নিম্নলিখিত ভাষাগুলির একটি—হিন্দী, ইংরাজী, উচ্চতর ইংরাজী, আধুনিক ভারতীয় ভাষা, আধুনিক বৈদেশিক ভাষা ও প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি)।

(খ) (১) **সামাজিক শিক্ষা**

(২) **সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত**।

(গ) **একটি শিল্প**

ঐচ্ছিক বিষয়

নিম্নলিখিত বিভাগগুলির যে কোন একটি হইতে তিনটি বিষয় :

প্রথম বিভাগ (প্রচলিত কলা—Humanities)

(ক) প্রাচীন ভাষা বা অন্য একটি ভাষা (খ) ইতিহাস, (গ) ভূগোল, (ঘ) অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান, (ঙ) মনোবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র, (চ) গণিত, (ছ) সঙ্গীত, (জ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় বিভাগ (বিজ্ঞান)

(ক) পদার্থবিদ্যা, (খ) রসায়নবিদ্যা, (গ) জীববিদ্যা, (ঘ) ভূগোল, (ঙ) গণিত, (চ) শারীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

তৃতীয় বিভাগ (কারিগরী—Technical)

(ক) ব্যবহারিক গণিত ও জ্যামিতিক অঙ্কন, (খ) ব্যবহারিক বিজ্ঞান, (গ) যন্ত্রবিজ্ঞান (Mechanical Engineering), (ঘ) তাড়িত বিজ্ঞান (Electrical Engineering)।

চতুর্থ বিভাগ (বাণিজ্যিক—Commercial)

(ক) বাণিজ্যিক কৃত্য (Commercial Practice), (খ) গাণনিক্য (Book-keeping), (গ) বাণিজ্যিক ভূগোল বা অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞান, (ঘ) সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং।

পঞ্চম বিভাগ (কৃষিবিজ্ঞান)

(ক) সাধারণ কৃষিবিদ্যা, (খ) পশুপালন, (গ) উদ্যান রক্ষা ও নির্মাণ, (গ) কৃষিবিষয়ক রসায়নবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা।

ষষ্ঠ বিভাগ (চারু কলা)

(ক) কলাবিদ্যার ইতিহাস, (খ) অঙ্কন এবং ডিজাইন শিক্ষা, (গ) চিত্রকলা (Painting), (ঘ) মডেলিং, (ঙ) সঙ্গীত, (চ) নৃত্য।

সপ্তম বিভাগ (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান)

(ক) গার্হস্থ্য অর্থনীতি, (খ পুষ্টি ও রঞ্জন বিদ্যা, (গ) মাতৃত্ব বিজ্ঞান ও শিশু পালন, (ঘ) সংসার পরিচালনা ও শুশ্রূষা।

অতিরিক্ত বিষয় নির্বাচন

উপরে উল্লিখিত বিভাগের বিষয়গুলি হইতে আরও একটি বিষয় শিক্ষার্থী অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে।

ভাষা সমস্যা

ভারতবর্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভাষা সমস্যার সমাধান করা এক জটিল ব্যাপার। আমাদের সংবিধানে ১৪টি ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। অধিকন্তু আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরাজীর প্রয়োজন রহিয়াছে। হিন্দীকে আমরা ভারত ইউনিয়নের জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। এমত অবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বহু ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সম্পর্কে কমিশনের মতামত এই যে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মাতৃভাষাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। মধ্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে কোন সময়েই তাহাদের দুইটির বেশি ভাষা শিক্ষা করিতে না হয়। এই স্তরে শেষের দিকে ইংরাজী ও হিন্দী শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্ততপক্ষে দুইটি ভাষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; ইহার অন্ততঃ একটি হইবে মাতৃভাষা।

ভাষা শিক্ষার মান সম্পর্কে কমিশনের মত এই যে শিক্ষার্থীকে তাহার মাতৃভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে এবং অন্য দুইটি ভাষা এইরূপ ভাবে শিখাইতে হইবে যে শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উহাদের ব্যবহার করিতে পারে।

৫। নূতন শিক্ষা পদ্ধতি

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে আরও উন্নত করিতে হইলে শিক্ষা-পদ্ধতিরও সংস্কার সাধন প্রয়োজন। এই জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষাপদ্ধতি এইরূপ হইবে যে ইহার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীগণের শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন নয়, একটি নূতন মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে, সুঅভ্যাস গঠিত হইতে পারে এবং সদিচ্ছা ও উৎসাহের সহিত আপন কায সম্পাদনে ইচ্ছা জন্মিতে পারে।

এইজন্য শিক্ষা প্রদানের সময় নানাবিধ উপায় যেমন, **কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা (Activity method)**, **প্রোজেক্ট পদ্ধতি** গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষার্থীকে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য যথেষ্ট কার্যের সুযোগ (expression work) প্রদান করিতে হইবে।

শিক্ষার্থী জ্ঞানকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য যাহাতে **পাঠাগার** এবং **মিউজিয়ামের** সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য উপযুক্ত **পাঠ্যপুস্তক** প্রণয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষাদানের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থীগণ নানাভাবে বিষয়টি দেখিতে ও শুনিতে পায় (Audio Visual Aids)। এই জন্য বিদ্যালয়ে ছায়াচিত্র (Films) এবং রেডিওর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে **গবেষণা বিদ্যালয়** (experimental schools) স্থাপন করিতে হইবে।

পরীক্ষা সংস্কার

পরীক্ষা সংস্কার সম্পর্কে কমিশন অনেকগুলি মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ে কমিশন বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং বাহিরের পরীক্ষা উভয়েরই প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন। পবীক্ষাকে বিষয়মুখী (objective) করিবার জন্য রচনা-মূলক পরীক্ষা পদ্ধতিব স্থানে বিষয়মুখী অভীক্ষা (objective tests) প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। তবে রচনামূলক পবীক্ষা (Essay type examination) পদ্ধতিও যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন ইহা তাহারা স্বীকার করিয়াছেন। পবীক্ষাব জন্য রচিত প্রশ্নপত্র এইরূপ হইবে যে উহার সাহায্যে শিক্ষার্থীব প্রকৃত জ্ঞান পবীক্ষা করা যাইতে পারে, শিক্ষার্থী যেন মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে উহাব উত্তব প্রদানে সক্ষম না হয়।

শিক্ষকদের দ্বাবা গৃহীত বিদ্যালযেব পবীক্ষা এবং শিক্ষাকর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত শেষ পরীক্ষা,—শিক্ষার্থীব যোগ্যতা নির্ণয়ে উভয়ের প্রয়োজন কমিশন স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে রক্ষিত শিক্ষার্থীর উন্নতি-জ্ঞাপক বিবরণ পত্র (school records) শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সম্পর্কে সর্বাঙ্গীণ ধারণা করিবার জন্য প্রয়োজন। শেষ পরীক্ষাব ফলের সহিত বিদ্যালয়ের বিবরণপত্রও শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ে বিবেচনা করিতে হইবে।

পরীক্ষার মার্ক প্রদানের জন্য 'সাঙ্কেতিক পদ্ধতি' (system of symbolic marking) ব্যবহার করিতে হইবে অর্থাৎ 'পাঁচ অঙ্ক-বিশিষ্ট স্কেল (Five-point scale) ব্যবহারের দ্বারা সাধারণ ভাবে

যোগ্যতা নির্ণয় করিতে হইবে। যেমন A অতি উত্তম, B উত্তম, C সাধারণ, D মন্দ, এবং E অতি মন্দ। এই পদ্ধতির সুবিধা হইতেছে যে ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা মোটামুটি ভাবে বিচার করিয়া তাহাকে একটি গ্রেডের অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে। অঙ্কের দ্বারা মার্ক প্রদানের অসুবিধা এই যে ইহার সাহায্যে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার চুলচেরা বিচারের চেষ্টা হয়। এইরূপ পদ্ধতি বিজ্ঞান-সম্মত নহে। যেমন দুইজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন যদি ৪৫ পায় এবং অন্যজন যদি ৪৬ বা ৪৭ পায়, তবে তাহাদের যোগ্যতার পার্থক্য বিচার করা সহজ নহে। সুতরাং কমিশনের সুপারিশ এই যে পরীক্ষার নম্বর প্রদানের জন্য পুরাতন পদ্ধতি গ্রহণ না করিয়া সাঙ্কেতিক পদ্ধতি অর্থাৎ সাধারণ ভাবে যোগ্যতা নির্ণয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। তবে এইরূপ যোগ্যতার স্তর (grade) কে শতক স্কেলে (percentile scale) পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। অথবা কোন পরীক্ষক মার্ক প্রদানের সময় 'শতক স্কেল' ব্যবহার করিয়া পরে উহা, পরীক্ষার্থীর যোগ্যতা অনুযায়ী (categories) বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিতে পারেন।

পূর্বেই আমরা কোন বিদ্যার্থী সম্পর্কে বিদ্যালয়ের বিবরণ পত্রের (School records) প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছি। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য শেষ পরীক্ষার ফলাফলের সহিত বিদ্যালয়ের টেষ্ট পরীক্ষার ফলাফল যুক্ত করিতে হইবে। স্কুল রেকর্ড রাখিবার পদ্ধতি বিজ্ঞান-সম্মত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থী সম্পর্কে উন্নতিমূলক সম্পূর্ণ বিবরণ পত্রকে বলা হয় 'কিউমিলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড' (Cumulative record card)। সাধারণত এই বিবরণ পত্র নিয়মিত ভাবে প্রস্তুতের ভার শ্রেণী-শিক্ষকের উপর প্রদান করা উচিত। এই বিবরণ পত্র প্রস্তুতের যে বৈজ্ঞানিক নিয়ম আছে সেই সম্পর্কে শিক্ষকদের শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন শিক্ষকদের উপর এই ভার প্রদান করিলে ইহা অনেক সময় নির্ভরযোগ্য নাও হইতে পারে। তাহার উত্তরে কমিশন বলেন—'শিক্ষকদের উপর দায়িত্ব প্রদান করিয়াই একমাত্র উহাকে নির্ভরযোগ্য করা যাইতে পারে।'

নরয়ুড্ কমিটীর (Norwood Committee) পরীক্ষা সংস্কার বিষয়ক রিপোর্টে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে, শিক্ষকই শিশুদের যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য প্রকৃত বিচারক, কারণ তিনি শিশুর গুণাগুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারেন। সুতরাং কাহারও যোগ্যতা যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে নির্ণয়ের জন্য শিক্ষকদের দ্বারা গৃহীত পরীক্ষার ফলের সহিত স্কুলের অন্যান্য কাজের বিবরণ যোগ করিতে হইবে। এইরূপ ফলাফলের ভিত্তিতে যে যোগ্যতা পত্র (certificate) দেওয়া হইবে তাহাই পরীক্ষার্থীর প্রকৃত গুণ প্রকাশ করিবে।

কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর একটি মাত্র পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং উহা উপযুক্ত শিক্ষাকর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। উক্ত পরীক্ষা পাশের পর যে যোগ্যতা পত্র প্রদান করা হইবে তাহাতে স্কুলের টেষ্টের ফল, অন্যান্য কাজের বিবরণ এবং শেষ পরীক্ষার ফল উল্লেখ থাকিবে। শেষ পরীক্ষায় আংশিক পরীক্ষা পদ্ধতি (Compartmental examinations) প্রবর্তন করিতে হইবে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত সুপারিশগুলি প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রবর্তন করিবার জন্য কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন।

৭। সংগঠন ও শাসন
(Organisation and Administration)

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন এবং পরিচালনার জন্য কমিশন কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছেন। সর্বোচ্চস্তরে কেন্দ্রে এবং

বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রীদের একটি কমিটী থাকিবে। ইহারা বিভিন্ন মন্ত্রীর অধীন শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আলোচনা এবং সমাধানের ব্যবস্থা করিবেন। ইহার পরে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি সংযোজক কমিটী (Co-ordinating Committee) থাকিবে। ইহা বিভিন্ন বিভাগের অধিকর্তাদের দ্বারা গঠিত হইবে। এই কমিটীতে শিক্ষা-অধিকর্তা আহ্বায়ক (convener) হইবেন। ইহারা শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আলোচনা করিবেন এবং উন্নতির উপায় নির্দেশ করিবেন।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (Board of Secondary Education)

রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পরিচালনার জন্য একটি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থাকিবে। এই পর্ষদ রাজ্যের সাধারণ ও কারিগরী উভয় প্রকারের মধ্যশিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। রাজ্যের শিক্ষা-অধিকর্তা এই পর্ষদের সভাপতি হইবেন। এই পর্ষদ ২৫ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইবে; ইহার মধ্যে অন্ততঃ ১০ জন বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ হইবেন।

কমিশন পর্ষদের নিম্নলিখিত দায়িত্ব নির্দেশ করিয়াছেন :

(১) মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে অনুমোদন করা এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করা।

(২) পাঠ্যবিষয় ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণের জন্য কমিটী নিয়োগ।

(৩) পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

(৪) শিক্ষা-অধিকর্তাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা।

শিক্ষণ-শিক্ষা বোর্ড

স্নাতক শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থাকিবে।

অস্নাতক (Undergraduate) শিক্ষকদের ট্রেনিং প্রদানের জন্য একটি বোর্ড গঠন করিতে হইবে। এই বোর্ড স্নাতক শিক্ষকদের ট্রেনিং এর উন্নতির জন্যও উপযুক্ত পরামর্শ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড ও রাজ্য উপদেষ্টা বোর্ড

প্রথমটির কার্য হইবে বিভিন্ন রাজ্যের সকল শ্রেণীর শিক্ষা পরিচালনার মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করা এবং দ্বিতীয়টির কার্য হইবে রাজ্য শিক্ষা বিভাগকে শিক্ষার উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা।

৮। আর্থিক ব্যবস্থা

এ পর্যন্ত বিভিন্ন কমিশন ও কমিটী শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে সমস্ত সুপারিশ করিয়াছেন তাহা অর্থের অভাবে ঠিক মতো চালু করা সম্ভব হয় নাই। মুদালিয়র কমিশন এই জন্য আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও কিছু সুপারিশ ও মন্তব্য করিয়াছেন। সংবিধানে যদিও উল্লিখিত আছে যে শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, তবুও সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে শিক্ষার উন্নতি ও ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। কারণ উন্নততর শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্যে দেশের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করা যাইতে পারে, দায়িত্বশীল নাগরিক সৃষ্টি করা যাইতে পারে। এই সকল ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিশ্চয়ই কিছু দায়িত্ব থাকা উচিত।

বর্তমানে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত স্থান হইতে আমরা অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি। যেমন—

(১) রাজ্য সরকারের অনুদান।

(২) মিউনিসিপ্যালিটী এবং অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য।

(৩) জনসাধারণের দান।

(৪) ছাত্রবেতন।

বর্তমানে রাজ্য সরকার যেরূপ নিয়মে শিক্ষা-অনুদান প্রদান করেন কমিশনের মতে তাহার পরিবর্তন করা উচিত।

কমিশন **বৃত্তিমূলক শিক্ষার** (Vocational Education) উন্নতির উপর খুব জোর প্রদান করেন এবং বৃত্তি-শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি **কেন্দ্রীয় বোর্ড** গঠনের সুপারিশ করেন। তাহার নাম হইবে Federal Board of Vocational Education বা **বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থা**। এই বোর্ডের নিকট বৃত্তি-শিক্ষার উন্নতির জন্য যে অর্থ প্রদান করা হইবে, তাহা তাহারা রাজ্য বোর্ড-গুলির প্রয়োজনানুসারে বণ্টন করিবেন। এই বণ্টনের ব্যাপারে তাহারা রাজ্যের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (Size of the school-going population) অনুযায়ী রাজ্য সবকারের প্রাপ্য সাহায্যেব হার বিবেচনা করিবেন।

অর্থসংগ্রহের জন্য কমিশন আরও কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন।

(১) কারিগরী শিক্ষা কর (Technical Education Cess)

রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পের উপর এই কর ধার্য করিতে হইবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারী শিল্পসংস্থাসমূহ যেমন, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ ও অন্যান্য সরকারী শিল্প হইতে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইরূপে সংগৃহীত অর্থ কারিগরী ও বৃত্তি শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

(২) বেসরকারী দান

মধ্যশিক্ষার জন্য প্রদত্ত দান আয়করের আওতা হইতে বাদ দিতে হইবে। কেহ যদি মধ্যশিক্ষার উন্নতির জন্য অর্থ দান করিতে চাহেন তাহা হইলে সাধারণ মধ্যশিক্ষার জন্য প্রদত্ত অর্থের ২৫,০০০

টাকা পর্যন্ত এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য প্রদত্ত অর্থের ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়কর হইতে রেহাই দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) **দান ও ধর্মার্থ প্রদত্ত অর্থ ও সম্পত্তি**

(Religious and Charitable Endowments)

উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে তাহা শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয় করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন রাজ্যসরকারগুলির করা উচিত।

অন্যান্য ব্যবস্থা

শিক্ষার উন্নতির জন্য আরও বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ প্রদানের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় গৃহ এবং বিদ্যালয়ের জমি ইত্যাদির উপর কোনরূপ কর ধার্য করা উচিত নহে। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 'কাষ্টম কর' হইতে রেহাই দেওয়া উচিত।

মধ্য-শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রের দায়িত্ব

কমিশনের সুপারিশ এই যে মধ্যশিক্ষার কোন কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। যেমন,

(১) বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন,

(২) উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন,

(৩) কারিগরী বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা,

(৪) মধ্য-শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে গবেষণা,

(৫) শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার জন্য নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি।

৯। শিক্ষকদের সম্পর্কে ব্যবস্থা

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে কমিশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিয়াছেন।

উপযুক্ত কমিটীর মারফৎ শিক্ষকদের কার্যে নিয়োগ করিতে হইবে এবং এক বৎসরের জন্য উহাদিগকে পরীক্ষামূলক ভাবে কার্যে (Probation for one year) নিযুক্ত রাখিতে হইবে।

শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কমিশন স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্য রাজ্য সরকার একটি **বিশেষ কমিটী** মারফৎ (Special Committee) শিক্ষকদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবেন এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের হার (cost of living) অনুযায়ী **বেতনের হার** নির্দেশ করিবেন।

চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর যাহাতে শিক্ষকগণ অসুবিধায় না পড়েন এই উদ্দেশ্যে কমিশনের সুপারিশ এই যে প্রত্যেক রাজ্যে শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য **'ত্রিবিধ সাহায্য ব্যবস্থা'** (triple benefit scheme) চালু করিতে হইবে। অর্থাৎ শিক্ষকদের ভবিষ্যতে সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভাগ পেনশান, প্রসিডেণ্ট ফাণ্ড এবং জীবনবীমা এই তিনের সমবায়ে একটি ব্যবস্থা চালু করিবেন এবং এই সম্পর্কে সমস্ত বন্দোবস্তের ভার শিক্ষা-বিভাগকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

শিক্ষকগণ শারীরিক ও মানসিক সুস্থ থাকিলে ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত চাকুরী করিতে পারিবেন। শিক্ষকদের দ্বারা ঠিক মতো কাজ চালাইবার জন্য অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

তাহাদের ছেলেমেয়েদের ১৪ বৎসর পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ দিতে হইবে, বিদ্যালয়ের নিকটে থাকিবার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, অর্ধ হারে ভ্রমণের সুযোগ দিতে হইবে, ছুটিতে বিদেশে বা স্বাস্থ্যনিবাসে ছুটি কাটাইবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, অসুস্থ হইলে বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিক্ষণ শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কেও কমিশন নানাবিধ সুপারিশ করিয়াছেন।

১০। কমিশনের নানা সুপারিশ সম্পর্কে সমালোচনা

মুদালিয়র কমিশন রিপোর্টের নানাবিধ সুপারিশ ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ এই রিপোর্টেই প্রথমে ভারতবর্ষের মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থার একটি সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করা হইয়াছে এবং আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য যে উহার আমূল সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন ইহার দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা বোর্ড (Central Advisory Board of Education) ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে এক প্রস্তাব মারফৎ ঐ সুপারিশের অনেকগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

মুদালিয়র কমিশন রিপোর্টকে মধ্যশিক্ষার উন্নতিকল্পে এক উল্লেখ-যোগ্য সুপারিশ হিসাবে গ্রহণ করা হইলেও সুপারিশগুলি সম্পর্কে দেশে নানাবিধ সমালোচনা হইয়াছে। নানা কারণে ঐ সমালোচনা-গুলি উল্লেখযোগ্য। কারণ কোন বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা করিবার জন্য উহার বিরুদ্ধ মতগুলিও জানা বিশেষ প্রয়োজন।

সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সমালোচনা করা হইয়াছে। যেমন শিক্ষার রূপ (pattern), শিক্ষার কাল, পাঠ্যক্রম (curriculum), পরিচালনা (Administration), শিক্ষকদের সম্পর্কে সুপারিশ ইত্যাদি।

শিক্ষার রূপ সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন পুরাতন ধারার সহিত একটি নূতন ধারা যোগ করিতে চাহিতেছেন। শিক্ষাব্যবস্থা যদি জাতীয় জীবনের একটি অংশস্বরূপ হয়, তাহা হইলে উহাতে জাতীয় জীবনের বহু বৈশিষ্ট্য থাকিবে। অধিকন্তু জীবনের বৃদ্ধির ন্যায় উহার

বৃদ্ধি ও উন্নতিরও একটি নিজস্ব ব্যবস্থা থাকিবে। এইরূপ বৃদ্ধিকে বলা হয় 'জৈবিক বিকাশ' (organic development)। যে কোন রূপ শিক্ষা-সংস্কার করিতে হইলে, উহার বিকাশের ধারা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং ঐ পরিপ্রেক্ষিতে উহার সংস্কার ও উন্নতিসাধন করিতে হইবে। শিক্ষার বর্তমান ধারাকে অস্বীকার করিয়া, উহার স্থানে রাতারাতি একটি বিশেষজ্ঞ-রচিত প্যাটার্ণ চালাইতে গেলে জাতীয় জীবনেব সহিত উহার যোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং ঐ শিক্ষা জাতীয় আশা-আকাঙ্খা এবং লক্ষ্যের অনুকূল হইতে পারে না।

এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে কমিশন যে ধরণের শিক্ষা-ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে দেশের বাস্তব অবস্থা পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে দেশে (পশ্চিমবঙ্গে) দশ শ্রেণী-বিশিষ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয় বর্তমান আছে এবং ইহাতে সাধাবণভাবে একই প্রকারের পাঠ্যবিষয় প্রচলিত আছে। মুদালিয়র কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিতে হইবে এবং বর্তমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান উন্নত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান মাধ্যমিক কলেজগুলি তুলিয়া দিয়া উহার একটি শ্রেণী উচ্চবিদ্যালয়ের সহিত এবং অন্য শ্রেণীটি স্নাতক কলেজগুলির সহিত যোগ করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষাকে উন্নত করিতে হইলে উহার পাঠ্যবিষয়ও এরূপভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে যে উহা শিক্ষার্থীর বয়স ও মনের ধারার অনুকূল হয়। কমিশনের এই মন্তব্য সম্পর্কে সকলে নিশ্চয়ই একমত হইবেন। কিন্তু এই সম্পর্কে অনেকের আপত্তি হইতেছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে এইরূপ সংস্কার সাধন করিতে হইলে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম শ্রেণী হইতেই উহা করা উচিত। বর্তমান ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতেই যদি সংস্কার আরম্ভ করা যায়,

তবে ৬।৭ বৎসরের মধ্যেই দেশের শিক্ষাব ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হইবে। মুদালিয়র কমিশন শিক্ষা সংস্কারের এই পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা করেন নাই।

পাঠ্যক্রম সম্পর্কেও অনেকের বহু আপত্তি আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা যদি চরিত্র সৃষ্টির শিক্ষা হয়, তবে পাঠ্যক্রম সম্পর্কেও আমাদের যথেষ্ট চিন্তা করিতে হইবে। মধ্যশিক্ষাস্তরে নিশ্চয়ই আমরা শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কবিবাব চেষ্টা করিব না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইবে উদাব দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন বিভিন্ন বিষয়ের সহযোগে সম্পূর্ণ। সেই সেই বিষয়গুলিই আমরা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূত করিব যাহার দ্বারা শিক্ষার্থীর মনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। কিন্তু কমিশন বহুবিধ পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষার্থীর রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী যে সুযোগ দিতে চাহিতেছেন তাহা বর্তমান অবস্থায় বিবিধ বাস্তব কারণে গ্রহণযোগ্য নহে। কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষজ্ঞে পরিণত কবা মাধ্যমিক স্তরে সম্ভব নহে ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে কমিশন-উল্লিখিত পাঠ্যক্রম মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তন কারতে হইলে যেরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহা বর্তমানে কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। ইহাতে বহু অর্থের প্রয়োজন হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক ও যন্ত্রপাতির কথা আমরা ইহাব মধ্যে নাইবা ধরিলাম।

পরিচালনার ক্ষেত্রেও কমিশন পুরাতন ব্যবস্থা নূতন করিয়া প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি নানা কারণে গ্রহণযোগ্য হইলেও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষাবোর্ডগুলি এবং মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটীগুলি যোগ্যতার সহিত তাহাদের দায়িত্ব পালন

করিতে পারে নাই। সুতরাং ম্যানেজিং কমিটীর পরিবর্তে অন্য কোন উপায়ে বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা করা উচিত।

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে অনেক সুপারিশ করা হইলেও শিক্ষকদের মূল বেতনের হার সম্পর্কে কমিশন কোন সুপারিশ করেন নাই। আজ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান দুরবস্থা শিক্ষকদের। তাহাদের চাকুরীর কোন স্থায়িত্ব নাই, অনেকে নিয়মিত বেতন পান না, ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নাই, বেতনের হার এত অল্প যে তাহাদের পক্ষে সংসার চালানোই অসম্ভব ব্যাপার। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে কোন বাস্তব ব্যবস্থা কমিশনের নিকট হইতে আশা করা গিয়াছিল। যদি কমিশন শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যাপারে রাজ্য গভর্ণমেণ্টসমূহকে দায়িত্ব প্রদান করিতেন এবং উহা মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের অন্তর্ভূক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিতেন, তাহা হইলে কমিশনের রিপোর্ট শিক্ষকদের নিকট বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য হইত।

এই সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কমিশনের রিপোর্ট মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যে এক ব্যাপক সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট (১৯৫৪)

(দে কমিশন)

'দে কমিশন' গঠন, পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষার বৈশিষ্ট্য, পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষাব বর্তমান অবস্থা—প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য বিদ্যালয় বা নিম্নতব উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষা, মধ্যশিক্ষার নব রূপ, মধ্যশিক্ষা পবিচালনা, শিক্ষক সমস্যা, সমালোচনা।

১৯৪৭ সাল হইতে দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতেই শিক্ষাক্ষেত্রে এক আমূল সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকবিক্ষোভ, জনসাধারণের আন্দোলন ও অন্যান্য কারণে শিক্ষাসংস্কারের ব্যাপারে আর বেশি দেরী করা সম্ভব ছিল না। ১৯৫৩ সালে মুদালিয়র কমিশন তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করিলেন। এই কমিশনের রিপোর্টে সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী একটি মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। আমরা মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই বলিয়াছি যে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতকল্পে নানাবিধ সুপারিশ-বিশিষ্ট ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট উক্ত কমিশনের সুপারিশগুলি মোটামুটি গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সুপাবিশগুলি পশ্চিমবঙ্গের নূতন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতখানি কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং সুপারিশের জন্য নূতন একটি কমিশন গঠন করিলেন। এই কমিশন 'দে কমিশন' (১৯৫৪) নামে খ্যাত এবং এই রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যেরূপ বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে তেমনি বর্তমান জটিল অবস্থা অনুসারে মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা কি ভাবে পুনর্গঠন করা যাইতে পারে সেই সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে। কারণ মুদালিয়র কমিশন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মধ্যশিক্ষা সংস্কারের জন্য যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে কিছু পরিবর্তন হইতে পারে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দে কমিশনের রিপোর্ট যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা সংস্কারের জন্য এক উল্লেখযোগ্য সুপারিশ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

'দে কমিশন' তিন জন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ লইয়া ১৯৫৪ সালের

জুলাই মাসে গঠিত হয়। তাহারা যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহা একাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রায় ৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ঐ রিপোর্ট ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে সম্পূর্ণ হইলেও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে উহা ১৯৫৬ সালের পূর্বে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষার বৈশিষ্ট্য

কমিশন রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষার ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। কারণ এই রাজ্যে মধ্যশিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রাধান্য বেশি। কেন এইরূপ হইয়াছে তাহা আলোচনা করিতে গেলে এই রাজ্যে মধ্যশিক্ষার অতীত ইতিহাস জানা দরকার। ১৮৫৪ সালে উড্ ডেসপ্যাচ (Wood Despatch) মারফৎ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন নীতির সূত্রপাত করা হইল। ইহাতে বলা হইল যে মধ্যশিক্ষা ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট সরাসরি দায়িত্ব না লইয়া অনুদান (grants) পদ্ধতির মারফৎ বেসরকারী প্রচেষ্টার উপর স্কুল পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দিবেন। এই নীতির ফলে নূতন অনুদানের সাহায্য লইয়া দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

১৮৮২ সালে 'হাণ্টার কমিশন' লক্ষ্য করিলেন যে বাংলা দেশে মধ্য-বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগ সাহায্য-প্রাপ্ত মধ্যবিদ্যালয়-সমূহের সহিত যুক্ত; অন্যান্য প্রদেশে এই হার অনেক কম। বেসরকারী প্রচেষ্টার অন্যতম ফল হইল যে বিদ্যালয় পারচালনা ব্যাপারে বাহিরের হস্তক্ষেপ অনেকে পছন্দ করিতেন না, এবং সেইজন্য কোনরূপ সরকারী সাহায্যের জন্যও তাহারা চেষ্টা করিতেন না। ফলে প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে দুই একটি বেসরকারী বিদ্যালয় শিক্ষার উচ্চতর মান বজায়

রাখিতে সক্ষম হইলেও, অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পক্ষে ইহা রাখা সম্ভব হইল না। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই আর্থিক দুরবস্থার মধ্য দিয়া বিদ্যালয় চালাইতে লাগিল এবং ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে লাভের মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল।

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষা বিস্তারের এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের মধ্যবিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ও ছাত্র-সংখ্যা সম্পর্কে বিচাব করিয়া দেখা উচিত। কমিশন দেখাইয়াছেন **বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৮৭৯টি সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয় আছে এবং ইহার ছাত্রসংখ্যা হইতেছে ২৫০,০০০ এবং ৫০৩টি বেসরকারী অসাহায্য-প্রাপ্ত (Unaided) বিদ্যালয় আছে যাহার ছাত্রসংখ্যা হইতেছে ১৫০,০০০।**

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলিব অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাদের অধিকাংশই মধ্য বিদ্যালয় (Middle Schools) হইতে উন্নত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের অধিকাংশই স্থাপিত হইয়াছিল মধ্য বিদ্যালয়রূপে এবং পরে ধীবে ধীরে নূতন শ্রেণী যোগ কবিয়া ইহারা উচ্চ বিদ্যালয়ে পবিণত হইয়াছে। অর্থাভাব, উপযুক্ত শিক্ষকেব অভাব প্রভৃতি কাবণে ইহাদেব মান স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চ হইতে পারে নাই। ফলে দেশের বিভিন্ন অংশে বহু দুর্ব্বল এবং দবিদ্র বিদ্যালয়ের জন্ম হইল।

১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশনও (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন) এইরূপ সুপারিশ করিলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষাব উন্নতির জন্য এই পরিচালনা ব্যবস্থার পরিবর্তন অবিলম্বে করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তাহারা একটি বোর্ডের মারফৎ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক কলেজগুলি পরিচালনার জন্য সুপারশ করিলেন এবং

মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হইতে বোর্ডের অধীনে আনিবার প্রয়োজন এইরূপ মন্তব্যও করিলেন।

কিন্তু স্যাডলার কমিশনের সুপারিশগুলির প্রধান ত্রুটি ছিল যে তাহারা শিক্ষাবোর্ডের গঠন বিধির মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিলেন।

এই সুপারিশ অনুযায়ী মধ্যশিক্ষা বোর্ড গঠনের জন্য ১৯১৯ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বহু চেষ্টা হইল। কিন্তু দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-বর্গের তীব্র বিরোধিতার ফলে এই বোর্ড গঠন করা সম্ভব হইল না। তবে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক কলেজগুলির জন্য **ঢাকা মধ্য-শিক্ষা বোর্ড** গঠিত হইল। সুতরাং দেশের অন্যান্য অংশে মধ্য শিক্ষা সম্পর্কে পূর্বাবস্থা বজায় রহিল এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই যে ১৯২৫ সালে নূতন প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়মাবলী অনুযায়ী ইংরাজীর পরিবর্তে **মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদানের নীতি** প্রবর্তিত হইল। নূতন প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়মাবলীতে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইল কিন্তু অর্থের অভাবে ঐ বিষয়গুলি কোন বিদ্যালয়েই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইল না।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করিয়া দেশ স্বাধীনতা লাভ করিল বটে কিন্তু সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ হইতে এত লোকের সমাগম হইতে লাগিল যে সমগ্র প্রদেশে এক জটিল অবস্থা দেখা দিল। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই নূতন লোক আমদানী হইবার ফলে এক ব্যাপক পরিবর্তন আরম্ভ হইল। নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। বঙ্গ বিভাগের পূর্বে সমগ্র বঙ্গে ১৯৪৬-৪৭

সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,৮১৪টি, এবং পশ্চিমবঙ্গে ঐ সংখ্যা ছিল ৭৬১টি, কিন্তু এখন নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার ফলে উহা দাঁড়াইয়াছে ১,৪২০টি, তাহার মধ্যে ২৫৩টি বালিকা বিদ্যালয়।

যখন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কার্যভাব গ্রহণ কবিলেন তখন শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনাব প্রয়োজন তাহারা উপলব্ধি করিলেন। ১৯৪৮ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব গঠন, লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ে তদন্ত ও পরিবর্তনের সুপারিশের জন্য **পশ্চিমবঙ্গ স্কুল শিক্ষা কমিটী** (School Education Committee) গঠিত হইল। ঐ কমিটী যে রিপোর্ট দাখিল করিলেন। উহাতে তাহারা সুপারিশ করিলেন—

(১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার কাল ১১ বৎসর হইবে। ইহার জন্য বর্তমান ১০ বৎসব শিক্ষা-কালের সহিত অতিরিক্ত এক বৎসর যোগ করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার কাল হইবে ৫ বৎসর এবং মাধ্যমিক শিক্ষার কাল হইবে ৬ বৎসর। এই ১১ বৎসরের শিক্ষার দ্বারা বর্তমান ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাব বিষয়গুলি বর্তমান মান অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করানোই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে না।

(৩) পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার (control and regulate) জন্য একটি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠন করিতে হইবে। ইহা শিক্ষামন্ত্রীকে শিক্ষার উন্নতিকল্পে সাহায্য করিবে।

১৯৫০ সালে মধ্যশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি বিল আনিয়া পশ্চিমবঙ্গ **'মধ্যশিক্ষা পর্ষদ'** গঠন করিলেন। ঐ পর্ষদ ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাস হইতে কার্য আরম্ভ করিল।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রণ, মঞ্জুরী দান, সাহায্য দান পাঠ্যক্রম নির্ধারণ প্রভৃতি কার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে এই নূতন বোর্ড গ্রহণ করিল। এই বোর্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার ছিল যে এই বোর্ডের অধীন কোন পরিদর্শক-মণ্ডলী ছিল না। পরিদর্শকমণ্ডলী সরকারী শিক্ষাদপ্তরের অধীন ছিল। স্কুল শিক্ষাকমিটী পরিদর্শকমণ্ডলীকে বোর্ডের অধীনে আনিবার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় 'দ্বৈত-শাসন' (Dual control) চলিতে লাগিল।

এই নূতন বোর্ড তিন বৎসর পর্যন্ত কার্য পরিচালনা করিল। কিন্তু মধ্যশিক্ষা ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় ১৯৫৪ সালের ১১ মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং গভর্ণমেণ্ট একজন 'এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর' (Administrator) নিযুক্ত করিয়া উহার কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মধ্যশিক্ষা ক্ষেত্রে অন্য একটি ঘটনা ঘটিল। সারা ভারতের মধ্যশিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও উন্নতির সুপারিশ করিবার জন্য 'মধ্যশিক্ষা কমিশন' গঠিত হইল। ঐ কমিশন ১৯৫৩ সালে তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিলেন। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্য-শিক্ষা সম্পর্কে তদন্ত ও সুপারিশ করিবার জন্য বর্তমান কমিশন গঠিত হইল।

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষার বর্তমান অবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়ে কমিশন মধ্যশিক্ষার উন্নতির জন্য রাষ্ট্রের যে সর্বাপেক্ষা বেশি দায়িত্ব লওয়া উচিত এই নীতির সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজন

তাহারা স্বীকার করিয়াছেন। তবে ঐ প্রচেষ্টা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভূত হওয়া উচিত।

চতুর্থ অধ্যায়ে কমিশন পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কবিয়াছেন।

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়

বর্তমানে এই শিক্ষা কয়েকটি নার্শারী বিদ্যালয়, মন্তেসরী বিদ্যালয় এবং কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের মারফৎ পরিচালিত হইলেও এই স্তর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থা তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় মারফৎ পরিচালিত হয়,—যথা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য বিদ্যালয় বা নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়

বঙ্গীয় (গ্রাম্য) প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার কাল নির্ধারণ করা হইয়াছে ৪ বৎসর। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১৭০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমান আছে। ইহার মধ্যে ২২০টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের নীতি হইতেছে যে রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে ধীরে ধীরে পাঁচ শ্রেণী-বিশিষ্ট নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা। কেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য অনুযায়ী এই কার্য করা হইবে। সুতরাং ভবিষ্যতে প্রাথমিক শিক্ষার কাযকাল হইবে পাঁচ বৎসর। যে পর্যন্ত এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ না হইবে সে পর্যন্ত পঞ্চম শ্রেণী রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত থাকিবে এবং এই শ্রেণীতে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা যাইবে না।

মধ্যবিদ্যালয় (Middle School) বা নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয় (Junior High School)

রাজ্যে এই স্তরের বহু প্রকারের বিদ্যালয় বর্তমান। কোন

বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী বিদ্যমান; এবং অন্য এক শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে যাহাকে বলা হয় বর্দ্ধিত মধ্যবিদ্যালয় (Extended High School), ইহাতে পঞ্চম হইতে অষ্টম এই চারিটী শ্রেণী বিদ্যমান। অন্য এক শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে যাহাকে বলা হয় উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ইহাতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৯ম শ্রেণী পযন্ত এই তিনটি শ্রেণী বিদ্যমান। এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা নগণ্য। ৪ শ্রেণী-বিশিষ্ট নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয়েব সংখ্যা ১৯৫২-৫৩ সালের হিসাব অনুযায়ী মোট ২৮০টি। ইহাব মধ্যে বালক বিদ্যালয় ২২৪টি এবং বালিকা বিদ্যালয় ৫৬টি। দুই শ্রেণী-বিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা বালকদের জন্য ৯৭০টি এবং বালিকাদের জন্য ১৩৯টি। এই বিদ্যালয়-গুলির এক পঞ্চমাংশ কোনরূপ সরকারী সাহায্য লাভ করে না। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়সমূহে মোট ছাত্র-সংখ্যা ১২৯,৯০৮; তাহার মধ্যে বালকদের সংখ্যা ১০৮,৮৫৮ এবং বালিকাদের সংখ্যা ২১,০৫০; এইরূপ বিদ্যালয়গুলির জন্য মোট ব্যয় ৬৯ লক্ষ টাকা; তাহার মধ্যে ৩১'৫ লক্ষ টাকা ছাত্রছাত্রীরা বেতন হিসাবে প্রদান করে এবং ১'৫৩ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট হিসাবে প্রদান করেন।

কমিশন লক্ষ্য করিয়াছেন এইরূপ বিদ্যালয়ের শতকরা ২৫ ভাগ শিক্ষক প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ নহেন এবং এক তৃতীয়াংশ শিক্ষক মাত্র ট্রেনিং প্রাপ্ত। এই শ্রেণীর ১৪০৭টি বিদ্যালয়ে মাত্র ৭২৪ জন গ্রাজুয়েট শিক্ষক কার্য করেন।

দুই শ্রেণী-বিশিষ্ট মধ্য বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অদ্ভুত। তাহারা কোনরূপ সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করে না। জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে অবশ্য নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত করা যাইতে পারে। কারণ প্রাথমিক শ্রেণীগুলির সহিত একত্রে তাহারা ৮ বৎসর কাল শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে এবং এই ব্যবস্থা আমাদের

সংবিধান অনুযায়ী। কারণ সংবিধানের ৪৫ ধারায় যেরূপ মানের শিক্ষা ভবিষ্যতে ভারতীয় নাগরিকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষা হিসাবে পরিগণিত হইবে, তাহার ব্যবস্থা এই বিদ্যালয়গুলির সাহায্যে হইতে পারিবে। কিন্তু দুই শ্রেণী-বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলির সাহায্যে এইরূপ কিছু আশা করা সম্ভব নয়। এইজন্য কমিশনের সুপারিশ এই যে. দুই শ্রেণী-বিশিষ্ট মধ্যবিদ্যালয়গুলিকে অবিলম্বে নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিতে হইবে অথবা ইহাদের পাঁচ শ্রেণীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে দুই শ্রেণী-বিশিষ্ট বিদ্যালয় হিসাবে ইহাদের কোন প্রয়োজন নাই।

উচ্চ বিদ্যালয় (High School)

উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কার্য-প্রণালী, মান এবং আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সুন্দর ছবি দে কমিশন অঙ্কন করিয়াছেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে দে কমিশন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, যেমন,—বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং জেলা ভেদে অবস্থান, এই পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য, বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিন্যাস, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক, বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা এবং শিক্ষার অপচয় ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা (১৯৫৪ সালের হিসাব অনুসারে) ১৪১৮টি; ইহার মধ্যে বালকদের বিদ্যালয় ১১৬৫টি এবং বালিকাদের বিদ্যালয় ২৫৩টি।

কমিশন লক্ষ্য করিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে বালিকাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বালকদের সংখ্যা অপেক্ষা অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গের ১২ বর্গ মাইল এলাকার জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে,—কিন্তু ইহা সমগ্র অংশে সমান ভাবে

ছড়ানো নয়। এই জন্য কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে ইহা অত্যন্ত অল্প। গ্রাম্য অঞ্চলে ছাত্র-সংখ্যা নবম শ্রেণীতে যথেষ্ট কমিয়া যায়। তাহার কারণ বর্তমানে অনুমোদন পাইবার জন্য যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহাতে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশে হার ধরা হইয়া থাকে। এইজন্য পাশের হার নিয়মানুযায়ী দেখাইবার জন্য নবম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা কম হইয়া যায়। কারণ এই শ্রেণীতে পরীক্ষার সময় যথেষ্ট কড়াকড়ি করা হইয়া থাকে।

বর্তমানে ৫ম হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এই ৬টি শ্রেণী মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত। কোন কোন বিদ্যালয়ে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী এবং কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রথম ৪টি শ্রেণীই রাখা হইয়াছে। বর্তমানে মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং বিহারে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ১১ বৎসরের কোর্স বর্তমান, পশ্চিমবঙ্গে তেমন নাই। এইখানে ১০ বৎসরের কোর্স চালু আছে। উচ্চ শ্রেণীর সহিত নিম্ন শ্রেণীগুলি যুক্ত থাকাতে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সহিত পঞ্চম শ্রেণী সংযুক্ত থাকাতে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে এরূপ অনেক শিক্ষক রহিয়াছেন, যাহাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবারই মাত্র যোগ্যতা আছে। ইহাদের যোগ্যতা বিচার করিলে উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত রাখিবার কোন যুক্তি নাই। উচ্চ বিদ্যালয়গুলির নিম্ন শ্রেণীতে পড়াইবার জন্য শিক্ষকদের ইন্‌টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ হওয়া উচিত অথবা তাহাদের উচ্চতর মধ্যবিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া উচিত।

বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সহিত পঞ্চম শ্রেণী যুক্ত থাকাতে বিদ্যালয়গুলির আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা খুব বেশি হইয়া থাকে।

কিন্তু শিক্ষার দিক হইতে বিবেচনা করিলে পঞ্চম শ্রেণী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে নানা কারণে ইহা সম্ভব নয় বলিয়া কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন যে পঞ্চম শ্রেণীগুলিকে স্কুলবোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত; তবে এই শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন প্রদান করিতে হইবে। এই পরিবর্তনের সুবিধার জন্য বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা আইনটি উপযুক্ত সংশোধন করা উচিত। পঞ্চম শ্রেণী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে পৃথক করিবার ফলে বিদ্যালয়ের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে, গভর্ণমেণ্ট তাহা পূরণের জন্য অতিরিক্ত সাহায্য করিবেন।

কমিশন লক্ষ্য করিয়াছেন যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষার জন্য অনেক কম ব্যয় করেন। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ১৬ ভাগ; কিন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশে ঐ ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৩২, ২৩ ও ২৪ ভাগ। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা প্রদত্ত বেতনের সাহায্যে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ নির্বাহ হয়। উপরোক্ত তিনটি রাজ্যে ঐ ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা হিসাবে যথাক্রমে ৪৬, ৫০, ৫২ ভাগ মাত্র।

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য উল্লিখিত বিবরণের ভিত্তিতে কমিশনের সুপারিশ এই যে উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে নানাবিধ বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষা

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরে আসে মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষা (Intermediate Colleges)। পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৭টি স্নাতক

কলেজ এবং ৩২ টি মাধ্যমিক কলেজ আছে। অবশ্য স্নাতক- কলেজ-গুলিতে মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষা প্রদান করা হয়। এই কলেজ-গুলির মধ্যে ১০ টি স্নাতক কলেজ এবং ২ টি মাধ্যমিক কলেজ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই শিক্ষার পরেই ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী কোর্সে যোগদান করিতে অথবা অন্য কোন উচ্চতর বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

শিক্ষার সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কে কমিশনের অভিমত এই যে—

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্তমান মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতেই হওয়া উচিত।

২। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান মাধ্যমিক কলেজের সহিত বর্তমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতম দুইটি শ্রেণী যোগ করা উচিত। এই শ্রেণীতে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। ১২ বৎসরের শিক্ষার পর বর্তমান মাধ্যমিক কলেজের পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

৪। সাধারণ এবং অনার্স উভয় প্রকারের স্নাতক শ্রেণীর শিক্ষার কার্য হইবে তিন বৎসর।

দে কমিশনের উপরোক্ত অভিমত নিখিল ভারত মধ্যশিক্ষা-কমিশন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা সংস্থার অভিমতের অনুরূপ। দে কমিশন মনে করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কার করা হইলে মাধ্যমিক কলেজগুলি উহা হইতে পৃথক হইবে।

মধ্যশিক্ষার নব রূপ

(The new pattern of Secodary Education)

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করিয়া কমিশন মধ্যশিক্ষার

উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন। বর্তমানে মধ্যশিক্ষার জন্য মাধ্যমিক কলেজের শিক্ষা সমেত মোট ১২ বৎসরের শিক্ষা প্রচলিত আছে। এই ১২ বৎসরের শিক্ষাকালকে কমিশন নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করিতে চাহিয়াছেন :—

(ক) প্রাথমিক শিক্ষা,—শিক্ষার কাল ৫ বৎসর।

(খ) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা উচ্চতর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা ; শিক্ষার কাল তিন বৎসর (ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত)।

(গ) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা (নবম শ্রেণী হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)। বর্তমানের মাধ্যমিক কলেজের দুই বৎসরের শিক্ষা উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ দুইটি শ্রেণীর সহিত যোগ করিতে হইবে।

কমিশনের মতে উপরের তিনটি স্তরের সমন্বয়ে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গঠিত হইবে। প্রত্যেকটি স্তরেই এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যে শিক্ষার্থীরা তাহাদের শিক্ষা সমাপ্তির পর কোন উপযুক্ত বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে।

বর্তমানে বহু ছাত্রছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বয়স বর্তমানে ১১ বৎসর নির্ধারিত হইয়াছে। এই বয়সে ছাত্রছাত্রী-দের পক্ষে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও গুণ অর্জন করা সম্ভব নহে। তবে যাহাদের পিতামাতা বা অভিভাবক বিভিন্ন সামাজিক বৃত্তি যেমন কৃষি, বস্ত্রবয়ন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাজ, কাঠের কাজ, কুমারের কাজ ইত্যাদির সাহায্যে জীবিকা অর্জন করেন, এই বয়সের ছেলেমেয়েরা গৃহে ঐ সকল কাজে পিতামাতাকে সাহায্য করিতে পারে এবং ধীরে ধীরে ঐ সকল কাজ শিক্ষা করিতে পারে।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ ধরণের

বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন নাই ; কিন্তু ইহারা যখন ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক হইবে তখন তাহাদের জন্য বিশেষ বৃত্তি শিক্ষার উপযোগী নির্বাচিত কারিগরী বিদ্যালয় (Selected Technical School) স্থাপন করা যাইতে পারে।

যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আরও পড়াশোনা করিবে তাহারা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে আরও তিন বৎসর শিক্ষালাভ করিবে। আমাদের সংবিধানের ৪৫ ধারা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক সাধারণ শিক্ষার বয়স স্থির করা হইয়াছে ১৪ বৎসর। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার এই সংবিধান নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবে। এই হিসাবে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। শিক্ষার এই স্তরে ছাত্রছাত্রীদের ভাষা ও সাহিত্য, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক জ্ঞান, সাধারণ গণিত, শিল্প, অঙ্কন, সঙ্গীত, কলা (arts) এবং বালিকাদের গার্হস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম নির্দেশের ভার থাকিবে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উপর। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে একটি **পরীক্ষার** ব্যবস্থা থাকিবে। ইহার নাম হইবে **'সাধারণ সার্টিফিকেট পরীক্ষা'** (General Certificate Examination)। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়িবার যোগ্যতা নিরূপিত হইবে অথবা এই পরীক্ষার পরে তাহারা বিভিন্ন প্রকারের বৃত্তিশিক্ষাও গ্রহণ করিতে পারে। কয়েকটি নির্বাচিত নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে অথবা, এই উদ্দেশ্যে পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে।

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। এই বিভাগে শিক্ষার কাল হইবে ৪ বৎসর। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের

রুচি, প্রবণতা, ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

এই বহুমুখী পাঠ্যক্রম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ শিল্প ও কৃষি বিভাগের সহিত একযোগে কাজ করিবেন। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে। এই স্তরের শিক্ষার শেষে পুনরায় একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এবং উক্ত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং উচ্চতব কারিগরী বিদ্যাও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। যাহাবা এই স্তরের পর আর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ কবিতে চাহিবে না, তাহারা সরকারী ও বেসরকারী অফিসে বিভিন্ন কার্যে নির্বাচিত হইতে পারিবে।

বর্তমানে দেশে যে দশ বৎসরের উচ্চ বিদ্যালয়গুলি রহিয়াছে, সেই সম্পর্কেও বিবেচনা করিতে হইবে। দশ বৎসরের শেষে কোন সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হইবে না। শিক্ষা পর্ষদের নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন স্কুল পরীক্ষা গ্রহণ করিবে এবং উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করিবে। এই পরীক্ষায় পাশের পর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিবে। কমিশনের মতে প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া এই শিক্ষার জন্য পলিটেকনিক্ বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। যাহারা আর বেশি পড়াশুনা করিতে চাহিবে না, তাহারা সরকারী অথবা বেসরকারী কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

দে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার যে পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছেন,—তাহাতে উহাকে তিনটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে অন্যদিকে যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ইহাকে তাহারা বলিয়াছেন শিক্ষার বাঁক বা turning points. প্রত্যেক বিভাগে শিক্ষার যে বাঁক রাখা

হইয়াছে সেইখানে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও উহার সমান্তরাল (parallel) অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। কমিশন মনে করেন এই ব্যবস্থার সাহায্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় নিবারিত হইবে এবং ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের যোগ্যতা এবং সুযোগ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় শিক্ষালাভ করিতে পারিবে।

বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য সকল সময়ের (Full time) বিদ্যালয় স্থাপন ছাড়াও আংশিক সময়ে এবং সন্ধ্যার সময়ে শিক্ষার জন্য (Evening and part-time Courses) কারিগরী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ছাত্রছাত্রীদের থাকিবার জন্য হোষ্টেলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের জন্য এই ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে একটি শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে ইংরাজী ও বাংলা এই দুইটি ভাষাকে আবশ্যিক ভাষা হিসাবে শিক্ষা দিতে হইবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত রাষ্ট্র ভাষা হিন্দী শিক্ষা দিতে হইবে এবং নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অন্য একটি ভাষা যেমন সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কমিশনের মতে তিনটি ভাষা ছাত্রছাত্রীদের একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

কমিশনের মতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ দুইটি শ্রেণীতে শিক্ষার মাধ্যম হইবে ইংরাজী। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীতে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে।

মধ্যশিক্ষা পরিচালনা (Administration)

রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পরিচালনার জন্য একটি **মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থাকিবে এবং একজন বেসরকারী ব্যক্তি ইহার সভাপতি হইবেন। পর্ষদ**

মধ্যশিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে রাজ্য শিক্ষাদপ্তরকে উপদেশ দিবে, তবে কোন কোন ব্যাপারে তাহাদের সরাসরি দায়িত্ব থাকিবে।

রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য **আঞ্চলিক উপদেষ্টা কমিটী** থাকিবে। এই কমিটীগুলি স্ব স্ব এলাকায় মধ্যশিক্ষার উন্নতিকল্পে পর্ষদকে সাহায্য করিবে।

মধ্য বিদ্যালয়গুলি উপযুক্তভাবে পরিদর্শনের জন্য দে কমিশন কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন।

শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা আছে সেই সম্পর্কে কিছু কিছু পরিবর্তনের সুপারিশও কমিশন করিয়াছেন।

বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য পরিচালক সংঘ (Managing Committee) থাকিবে এবং উহা পাঁচ বৎসরের জন্য গঠিত হইবে। ম্যানেজিং কমিটীগুলিকে পর্ষদের সভাপতির অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ঐ কমিটীর সেক্রেটারী হইবেন।

শিক্ষক সমস্যা

শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকুরীর স্থায়িত্ব, ট্রেনিং প্রভৃতির উন্নতিকল্পে কমিশন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করিয়াছেন। প্রধান শিক্ষকদের সম্পর্কে কমিশনের মত এই যে ইহারা কেন্দ্রীয় সিলেকশান কমিটী কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং উহাদের বেতনের জন্য গভর্ণমেণ্ট দায়ী থাকিবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের বেতনের হার নির্ধারিত হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক স্কুলে এই হার বজায় রাখিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন। শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর জন্যও ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা-বোধ ও অন্যবিধ উন্নতির জন্য নানা প্রকার খেলাধুলা ও কাজের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

সমালোচনা

উপরে আমরা সংক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষার উন্নতির জন্য দে-কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি আলোচনা করিয়াছি। মুদালিয়র কমিশন সমগ্র ভারতের জন্য যে সুপারিশ করিয়াছেন তাহা রাজ্যভেদে বিভিন্ন হইতে বাধ্য। এই হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী দে কমিশনের মধ্যশিক্ষার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সুপারিশগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। কমিশনের বহু সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হইলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সম্পর্কে সমালোচনার অবকাশ আছে। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাহারা যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহার পিছনে কি প্রমাণ তাহারা পাইয়াছেন তাহা তাহারা উল্লেখ করেন নাই কোন বিষয়ের উন্নতি ও অবনতির মান নির্ণয় করিতে হইলে ঐ সম্পর্কে পরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজন।

রাজ্যের 'মধ্যশিক্ষার রূপ' সম্পর্কে কমিশনের মন্তব্য সকলের নিকটেই গ্রহণযোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয়। দশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় এবং দ্বাদশ শ্রেণী-যুক্ত উচ্চতর মধ্য বিদ্যালয়ের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের জন্য কমিশনের মন্তব্য চিন্তার যোগ্য। কিন্তু কমিশন ৮ম শ্রেণীর শেষে অর্থাৎ নিম্ন মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার শেষে একটি সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ কবিয়াছেন। অনেকে মনে করেন এইরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা না রাখিয়া অন্য কোন উপায়ে ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা নির্ণয় করা যাইতে পারে। দশম শ্রেণীর শেষে কমিশন কোন পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করেন নাই; দ্বাদশশ্রেণীর শেষে ঐরূপ পরীক্ষা গ্রহণের স্বপক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন। ঐরূপ ব্যবস্থায় কিছু অসুবিধা দেখা দিবে বলিয়া মনে হয়। দেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে দশ শ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয়গুলির একটি বিরাট সংখ্যক বার

শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর বিত্তালয়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে দশ শ্রেণীযুক্ত বিত্তালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষালাভে বাধা দেখা দিবে।

অবশ্য কমিশনের সমস্ত সুপারিশই পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষানীতি সম্পর্কে আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে কমিশন বহু সুপারিশ করিলেও কার্যক্ষেত্রে উহা কতটুকু সফল হইবে ঐ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কমিশন প্রধান শিক্ষকের মাহিনা প্রদান সম্পর্কে বলিয়াছেন যে উহার দায়িত্ব সরকার নিজেই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু অন্য শিক্ষকদের বেলায় স্থানীয় কমিটীর হাতে দায়িত্ব দিয়াছেন। একই বিত্তালয়ে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থার ফলে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে বলিয়া 'অনেকে মনে করেন।

তবে এই সমস্ত সামান্য ত্রুটি সত্বেও দে কমিশনের রিপোর্ট পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যশিক্ষাব উন্নতিকল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাব সূত্রপাত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

———

মধ্যশিক্ষার নব রূপায়ণ ও বহুমুখী বিদ্যালয়

শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা, মধ্যশিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার কাল, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক সমস্যা, সংগঠন ও শাসন, উপসংহার।

স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বাভাবিক কারণেই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এত কাল পর্যন্ত যে শিক্ষা-ব্যবস্থা বৈদেশিক শাসনের পরিপূরক হিসাবে বর্তমান ছিল তাহাকে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে পরিবর্তন করা যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। শিক্ষার এক ব্যাপক সংস্কারের জন্য তাহারা যে সমস্ত কমিটী ও কমিশন নিয়োগ কবিয়াছেন, তাহাদের সুচিন্তিত সুপাবিশের ভিত্তিতেই দেশের মধ্যশিক্ষার উন্নতির জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইয়াছে। মধ্যশিক্ষার সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত কমিশন ও বমিটীব সুপাবিশগুলি সামান্য কিছু পরিবর্তনের পব গ্রহণ কবা হইয়াছে।

(ক) **স্কুল শিক্ষক কমিটীর রিপোর্ট** (১৯৪৯)

পশ্চিমবঙ্গ সবকার কর্তৃক বাজ্যের স্কুল শিক্ষার সংস্কারের জন্য গঠিত হয।

(খ) **বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা রাধাকৃষ্ণণ্ কমিশনের রিপোর্ট** (১৯৭৮-৪৯)

বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষার উন্নতিকল্পে ভারত সবকার কর্তৃক গঠিত হয়। এই কমিশন তাহাদেব সুদীর্ঘ রিপোর্টে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্যও কিছু সুপারিশ করিয়াছেন।

(গ) **মধ্যশিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট** (১৯৫২-'৫৩) বা মুদালিয়র কমিশন রিপোর্ট।

এই রিপোর্টে সারা ভারতে মধ্যশিক্ষার উন্নতিকল্পে নানা বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ সুপারিশ করা হইয়াছে।

(ঘ) **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট** (**১৯৫৪**) বা দে কমিশন রিপোর্ট।

এই রিপোর্টে মুদালিয়র কমিশনের স্থপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী মধ্যশিক্ষার সংস্কারের জন্য নানাবিধ স্থপারিশ করা হইয়াছে।

মুদালিয়র কমিশনের স্থপারিশগুলি গভীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া **'কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থা'** (Central Advisory Board of Education) সমগ্র ভারতে মধ্যশিক্ষার সংস্কারের জন্য নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থপারিশ করিয়াছেন।

উক্ত সংস্থা ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসের এক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

(১) স্নাতক শিক্ষার কাল হইবে তিন বৎসরের এবং ছাত্রছাত্রীরা ১৭ বৎসর বয়সের পুর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে না।*

(২) মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থা হইবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ১৭ বৎসর বয়সে এই শিক্ষার পর শিক্ষার্থীরা জীবনের অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হইবে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। এই শিক্ষার পরেই শিক্ষার্থীরা তিন বৎসরের স্নাতক শিক্ষার যোগ্যতা লাভ কবিবে।

(৩) মধ্যবিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণীর নাম হইবে একাদশ শ্রেণী এবং অন্ততঃ ১০ বৎসরের শিক্ষার শেষে এই শ্রেণীতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। তবে মধ্যশিক্ষার সম্পূর্ণ কাল রাজ্য গভর্ণমেণ্ট নির্ধারণ করিবেন।

উপরোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষা সংস্কারের জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষার সম্পূর্ণ শিক্ষাকাল হইবে ১১ বৎসর; ইহার মধ্যে অবশ্য প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক অথবা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অন্তর্ভূত করিতে হইবে।

উচ্চ বিদ্যালয়ের কাল হইবে ৬ বৎসর, ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত।

প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষার সমন্বয়ে নিম্ন মধ্যবিদ্যালয় গঠিত হইবে; ইহাতে প্রথম হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ৮টি শ্রেণী থাকিবে।

৯ম হইতে ১১শ শ্রেণী সমন্বিত তিন শ্রেণী-বিশিষ্ট উচ্চতর মধ্যশিক্ষা বিদ্যালয় গঠিত হইবে। ইহাতে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা থাকিবে।

একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষাসমাপ্তির পর একটি সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হইবে এবং এই পরীক্ষার মান (standard) হইবে বর্তমান মাধ্যমিক কলেজগুলির প্রথম বৎসরের মান অনুযায়ী। এই পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীর বয়স হইবে অন্ততঃ ১৭ বৎসর।

নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষ্যের ভিত্তিতে মধ্যশিক্ষা পরিচালিত হইবে।

ইহার উদ্দেশ্য হইবে বালক-বালিকাদের এমন একটি সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে সমাজে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারে, এই মধ্যশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হইবে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুত করা।

উপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে যেরূপ শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা হইল। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী আমরা দেখিতেছি পশ্চিমবঙ্গে দুই শ্রেণীর মধ্য-শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। নিম্ন মধ্যবিদ্যালয় বা (Junior High School) এবং উচ্চ মধ্যবিদ্যালয় বা (Higher Secondary School)। উচ্চ মধ্যবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার কাল হইবে তিন বৎসর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মুদালিয়র কমিশনের মতে উচ্চ মধ্য-বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার কাল হওয়া উচিত ৪ বৎসর। এই সময়ের

প্রথম বৎসর অতিবাহিত হইবে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও রুচি উপলব্ধি করিবার জন্য এবং শিক্ষার পরবর্তী ২ বৎসর অতিবাহিত হইবে শিক্ষার্থীকে তাহার প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী নানা বিষয় শিক্ষা প্রদানের জন্য। 'দে কমিশন' অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষার কাল নির্ধারণ করিয়াছেন ১২ বৎসর।

মধ্যশিক্ষাব লক্ষ্য, শিক্ষাব কাল (duration), পাঠ্যক্রম (curriculum), সংগঠন ও শাসন (organisation and administration), শিক্ষকদের যোগ্যতা, পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয় লইয়া নানা আলোচনা হইয়াছে। মধ্যশিক্ষার নূতন ব্যবস্থার গুণাগুণ নির্ণয়ে ঐ আলোচনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে কবি।

মধ্যশিক্ষার লক্ষ্য

মধ্যশিক্ষার যে লক্ষ্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই সম্পর্কে নিশ্চয়ই শিক্ষাবিদগণ একমত হইবেন। প্রত্যেক দেশের ছাত্রছাত্রীদেব এক বিরাট অংশ মধ্যশিক্ষাকেই শেষ শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে এবং এই শিক্ষা সমাপ্তির পর তাহারা জীবিকা অর্জনে লিপ্ত হয়। বিভিন্ন অফিসেব নানা কার্যে, প্রাথমিক বিদ্যালযের শিক্ষক হিসাবে, বিভিন্ন কল-কারখানায় ও ব্যবসাক্ষত্রে মধ্যশিক্ষা সমাপ্তির পর দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা কাযে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের পক্ষে মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা হিসাবে পরিগণিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত মধ্যশিক্ষা সমাপ্তির পর অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই হিসাবে মধ্যশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য শিক্ষার্থীকে উচ্চতর শিক্ষা লাভের উপযুক্ত করা।

এই দুইটী লক্ষ্যের পরিপূরক হিসাবে অন্য একটি বিশেষ লক্ষ্যও

আমরা মধ্যশিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করিতে পারি। শিক্ষার সার্বজনীন লক্ষ্য হইতেছে শিক্ষার্থীকে মনুষ্যত্ব লাভে সাহায্য করা, চরিত্রবান করা, যাহাতে শিক্ষার শেষে দেশের সর্বপ্রকার পুনর্গঠন ও উন্নতিমূলক কার্যে তাহারা দায়িত্ব লইয়া অংশ গ্রহণ করিতে পারে। শিক্ষা জীবনের মনুষ্যত্বের ভিত্তিকে পাকা করিয়া গঠন করবে, শিক্ষার্থীর সুপ্ত শক্তির বিকাশে সাহায্য করে। এই সমস্ত দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে শিক্ষাব এই সার্বজনীন লক্ষ্য মধ্যশিক্ষার দ্বারা পূরণ হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সংবাদ সংগ্রহ (information) নয়, বা কয়েকটি বিষয়ে কেবলমাত্র দক্ষতা অর্জন নয়। পবিপূর্ণ বিকাশেব দিকে উপযুক্ত শিক্ষা মানুষকে পরিচালিত করে। শিক্ষার এই সার্বজনীন লক্ষ্যেব দিক হইতেও নব প্রবর্তিত মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থাকে আমাদের বিচার করা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটীব মতে ১৭ বৎসর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে একটি বিশেষ পর্যায়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের জন্য প্রস্তুত হইবে। এই হিসাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় প্রাথমিক শিক্ষাও একটি বিশেষ পর্যায়েব শেষ শিক্ষা। আমাদেব মতে কোন বিশেষ পর্যায়ের শিক্ষা কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে না। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই নূতন-তর শিক্ষাব ভিতর দিয়া মানুষকে অতিক্রম করিতে হয়। এই হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা ঠিক নহে। কারণ এই শিক্ষার শেষে যে ধরণের জীবিকা বা বৃত্তি কেহ গ্রহণ করিতে চাহিবে তাহার জন্য তাহার বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর অনেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবে। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমের মধ্যে এইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই যে এই শিক্ষা সমাপ্তির পর কেহ ঐ কার্যে সম্পূর্ণ দক্ষতা

অর্জন করিতে পারিবে। মাধ্যমিক শিক্ষার শেষে গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন বৃত্তি ও জীবিকা সম্পর্কে ঐ কথাই বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে ছাত্রছাত্রীদের বিশেষজ্ঞে পরিণত করা মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে তাহাদের প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী আপনাদিগকে বিকশিত করিতে পারে সেই সম্পর্কে সাহায্য করাই এই স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়—প্রত্যেক স্তরের শিক্ষার মধ্যেই ঐ উদ্দেশ্য বর্তমান আছে।

সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষার স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা কতদূর যুক্তিযুক্ত, ঐ সম্পর্কে অনেকের সন্দেহ আছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সংবাদ সংগ্রহ নয়। বিভিন্ন বিষয়ে বিবরণ সংগ্রহ (information) অথবা জ্ঞান (knowledge) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম আলোচনা করিলে মনে হয় যে উহাতে সংবাদ সংগ্রহের দিকেই বেশি জোর প্রদান করা হইয়াছে। জ্ঞানের শিক্ষা বিভিন্ন বিষয়ের যোগেই সম্পূর্ণ নয়, উহাতে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে যে শিক্ষার্থীর চিত্ত সঞ্জীবিত ও মন বিকশিত হইতে পারে, সমগ্র শরীর ও মনে এক পূর্ণতা লাভ হইতে পারে। শিক্ষার্থী এমন এক আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হইবে যে সংসারের প্রতি কর্মে সে পরিপূর্ণ আশা লইয়া আত্মনিয়োগ করিতে পারে। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রস্তাবিত মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অনেকে বহু ত্রুটি লক্ষ্য করিবেন মনে হয়।

শিক্ষার কাল (duration)

শিক্ষার্থীর বয়স (maturity) ও শিক্ষার সময়ের (duration) সঙ্গে শিক্ষার মান (standard) বিশেষভাবে নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর

বয়সের দিক হইতে বিবেচনা করিলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে ছাত্রছাত্রীদের বয়ঃ-সন্ধিকালের শিক্ষা বা কৈশোর কালের শিক্ষা হিসাবে অভিহিত করা যাইতে পারে। নূতন পরিকল্পনায় ১১ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ বয়স ধরা হইয়াছে ১৭ বৎসর। কিন্তু মুদালিয়র কমিশন ও দে কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার বয়স হওয়া উচিত ১৮ বৎসর।

মাধ্যমিক শিক্ষার বয়স ১৭ করিবার পক্ষে কর্তৃপক্ষের যুক্তি এই যে শিক্ষার বয়স বৃদ্ধি কবিলে অভিভাবকদেব আর্থিক ক্ষতি হইবে দ্বিতীয়ত, যদি শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার মাধ্যমে এবং উপযুক্ত পদ্ধতির সাহায্যে আমরা শিক্ষা দিতে পারি তবে যে কাজ অন্য দেশে ১৮ বা ১৯ বৎসরে সম্পন্ন হয়, তাহা আমরা ১৭ বৎসবেই শেষ করিতে পারিব। তৃতীয়ত, দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করিয়াছি দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য। এই পুনর্গঠনে অংশ গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের অবিলম্বে প্রয়োজন। সোভিয়েট রাশিয়াও দেশকে গঠনের জন্য, শিল্পে সমৃদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষার কাল কমাইয়া দিয়াছে। আবার বর্তমান ইন্টারমিডিয়েট্ কলেজগুলি উঠাইয়া দেওয়াতে ছাত্র-ছাত্রীদের দুইটির পরিবর্তে একটি মাত্র পরীক্ষা দিতে হইবে। ইহাতেও শিক্ষার জন্য কিছু সময় বেশি পাওয়া যাইবে। এই সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড মনে করে যে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ বয়স ১৭ বৎসর হওয়া উচিত।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মুদালিয়র কমিশন এবং দে কমিশন উভয়েই স্নাতক শিক্ষা আরম্ভের পূর্বে অন্ততঃ ১২ বৎসরের স্কুলের শিক্ষা প্রয়োজন, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণণ্ কমিশনও ১২ বৎসরের স্কুলের শিক্ষার সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বিভিন্ন দেশের স্কুলের শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার

একটি তুলনামূলক হিসাব দিয়াছেন। আমরা ঐ চিত্রটি সাধারণের অবগতির জন্য এইখানে উল্লেখ করিতেছি।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষাকালের তুলনা

দেশের নাম	ম্যাট্রিক	ইণ্টারমিডিয়েট অথবা অনুরূপ পর্যায়ের শিক্ষা	স্নাতক (Bachclor)	স্নাতকোত্তর (Master)	গবেষণা লব্ধ ডিগ্রী (Doctor)
ভারতবর্ষ বর্তমান	১০	১২	১৪	১৬	১৮
ভারতবর্ষ প্রস্তাবিত (রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী)	১০	১২	১৫	১৬ ও ১৭	১৮
ইংলণ্ড	—	১১	১৬	১৭	১৮
আমেরিকা	১২	১৪	১৬	১৭	১৯

অন্যান্য দেশের শিক্ষার কাল হিসাব করিলেও দেখা যায় যে প্রায় সর্বত্রই ১২ বৎসরের স্কুলের শিক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮।১৯ বৎসরের পূর্বে কোথায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ করা হয় না। অনেক দেশ এই ব্যবস্থাতেও সন্তুষ্ট হয় নাই। ফ্রান্সে ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যে স্কুলের শিক্ষা আরও ১ অথবা ২ বৎসর বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষাকে যদি আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে চাই এবং উহার মান যথেষ্ট উন্নত করিতে চাই তবে শিক্ষার কালও ঠিকমতো নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ১১ শ্রেণীর সমর্থকেরা যে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন তাহা বিভিন্ন কারণে গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। কারণ একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী যদি শিক্ষার মানকে

উন্নত করিতে হয়, তবে শিক্ষার কালও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করিতে হইবে। আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারে ইংলণ্ড, আমেরিকার অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতেও আমাদের মনে হয় মাধ্যমিক শিক্ষার বয়স ১৭ এর পরিবর্তে ১৮ হওয়া উচিত এবং শিক্ষার কালও ১১ এর পরিবর্তে ১২ হওয়া উচিত।

১১ বৎসরের পরিবর্তে শিক্ষার কাল ১২বৎসর করা হইলে নূতনভাবে শিক্ষা সংগঠনেব দিক হইতেও আমরা অনেক সুবিধা পাইতে পারিব। উন্নত শ্রেণীর দশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়গুলি আরও দুই বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দ্বাদশ শ্রেণী-বিশিষ্ট উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারিবে; আবার সাধারণ দশ শ্রেণী-বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলি বর্তমান অবস্থা বজায় রাখিতে কোনরূপ অসুবিধাব সম্মুখীন হইবে না। বর্তমানের ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলি মাধ্যমিক স্তরের শেষ দুই শ্রেণীর শিক্ষা দিতে পারিবে। ইহার সুবিধা হইবে এই যে শিক্ষাক্ষেত্রে কোনরূপ ওলট্-পালট্ সৃষ্টি না করিয়াও মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভবপর হইবে। এখন যেমন ছাত্রছাত্রীরা দশ শ্রেণী-বিশিষ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি হইতে পাঠ সমাপ্তির পর ইন্টারমিডিয়েট্ কলেজগুলিতে ভর্তি হইতে পারে, শিক্ষার পুনর্গঠন হইলেও তাহা তাহারা অনায়াসে করিতে পারিবে। তবে দে কমিশন এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে এই পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সামান্য কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হইবে।

অন্য একটি দিক হইতেও বিষয়টির আলোচনা প্রয়োজন। বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে। জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এবং আধুনিক বিদ্যার বিভিন্ন শাখার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া আধুনিক শিক্ষানীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া সকলেই জানেন যৌবন কাল শিক্ষার্থীদের জীবনে বিষম কাল।

এই বয়সে ছাত্রছাত্রীরা আবেগ ও উচ্ছ্বাসের দ্বারা চালিত হয়। প্রত্যেক আধুনিক দেশে এই চেষ্টা চলিতেছে যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স বাড়াইয়া দিয়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সুস্থ আবহাওয়ার মধ্যে আরও বেশিদিন রাখিবার ব্যবস্থা করা। ইংলণ্ডের ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশে বর্তমানে অর্থনৈতিক কারণে বাধ্যতামূলক শিক্ষার বয়স বৃদ্ধি করা সম্ভবপর না হইলেও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সুষ্ঠু শিক্ষার জন্য যে সময় প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে। এইজন্য মনে হয় দে কমিশন ও মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়া আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার বয়স ১৮ বৎসর করাই উচিত।

পাঠ্যক্রম (Curriculum)

প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উহাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ও প্রধান অংশকে বলা হইয়াছে **মুল বিষয়** বা Core subjects এবং অন্য অংশকে বলা হইয়াছে **ঐচ্ছিক বিষয়** বা Elective subjects. মূল বিষয়গুলি সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঐচ্ছিক বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের যোগ্যতা, রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইয়া গ্রহণ করিবে।

'তুলনামূলক শিক্ষার ইতিহাসের' ছাত্র মাত্রই জানেন যে এইরূপ পাঠ্যক্রম আমেরিকা যুক্তরাজ্যে বহুদিন হইতে অনুসরণ করা হইতেছে। মুদালিয়র কমিশন যে **বহুমুখী বিদ্যালয়** বা Multi-purpose School এর কথা বলিয়াছেন তাহা আমেরিকা যুক্তরাজ্যের

নকল ছাড়া কিছুই নহে। এখন উল্লিখিত পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের পশ্চাতে যে বিশেষ তত্ত্ব রহিয়াছে সেই সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষাবিষয়ক মনোবিজ্ঞানীরা দুইটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে যে মানুষ মাত্রেই বিভিন্ন গুণ, বুদ্ধি ও প্রবণতার অধিকারী, অর্থাৎ মানুষে মানুষে নানাবিষয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে। মনস্তাত্ত্বিকেরা এই বিষয়টির নামকরণ করিয়াছেন **'ব্যক্তি পার্থক্য'** বা Individual differences।

দ্বিতীয় বিষয়টি হইতেছে যে প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষার একটি স্বকীয় মূল্য আছে অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চারণ (transfer) ঘটে না। প্রত্যেকটি বিষয় যেমন শিক্ষা দেওয়া যাইবে, শিক্ষার্থীরা তাহাই শিখিবে; এই শিক্ষাব জন্য তাহাব অন্য কোন গুণের উৎকর্ষ হইবে না।

সুতরাং 'ব্যক্তি পার্থক্য' এবং 'শিক্ষার সঞ্চারণ' এই দুইটি মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের নির্ধারণের চেষ্টা চলিতেছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই সূত্র অনুসারে তাহার শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। একখানি 'তুলনামূলক শিক্ষার ইতিহাসে'র পুস্তকে দেখা যায় আমেরিকাব বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের রুচি, বুদ্ধি ও প্রবণতা অনুযায়ী প্রায় ৩০০টি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

'ব্যক্তি পার্থক্য' লইয়া আধুনিক মনস্তত্ত্বে বহু আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, রুচি, প্রবণতা (aptitudes) অনুযায়ী যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষাবিদদের মতে মানুষের কৈশোরে বয়ঃসন্ধিকালে এই পার্থক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে শিক্ষাবিদ্‌গণ বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার সময়ে অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষায় বহুমুখী পাঠ্যতালিকা প্রবর্তনের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের পরিকল্পিত বহুমুখী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যও ইহাই

যে তরুণ তরুণীদের রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

পাঠ্যক্রম নির্ধারণের দ্বিতীয় নীতি হিসাবে আমরা **'শিক্ষার সঞ্চারণ'** (transfer of training) তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছি।

এ পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে স্কুলপাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয় বিশেষ গুণসম্পন্ন অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিলে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, বিচার-বুদ্ধির উৎকর্ষ সমধিক সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে গণিত, সংস্কৃত বা গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের চেয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়, কারণ গণিত শিক্ষা করিলে শিক্ষার্থীর বিচার-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি বিকাশের অধিকতর সুযোগ ঘটে। বিখ্যাত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী **থর্ণডাইক** (Thorndike) এই বিষয়টি লইয়া বহু গবেষণা করেন। ১৩,৫০০ জন শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখিলেন যে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সহিত একটি বিচার-বুদ্ধি পরীক্ষার অভীক্ষার (Reasoning test) কতখানি সম্পর্ক, অর্থাৎ বিভিন্ন স্কুলপাঠ্য বিষয় কতখানি শিক্ষার্থীর বিচার-বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। সহগতি পদ্ধতির (Correlation method) সাহায্যে পরীক্ষা চালাইয়া ঐ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে থর্ণডাইক মন্তব্য করিলেন,—বিচার-বুদ্ধির উপর বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব কিছু নাই বলিলেই চলে অথবা উহা এত অল্প যে অনায়াসে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে।" এই পরীক্ষা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা হইল যে বিষয় হিসাবে শিক্ষার্থীর মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতির যে যোগ্যতা আছে, অনুরূপ যোগ্যতা রন্ধন বিদ্যা, সেলাই, হিসাবশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও বর্তমান। সুতরাং শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্য কোন বিষয়ের বিশেষ কোন মূল্য নাই ; সমস্ত বিষয়ই

সাধারণভাবে সমান মূল্য ধারণ করে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে অন্য একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে কোন বিষয়ের (subject) শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ভর করে ঐ বিষয় পড়াইবার পদ্ধতির উপর। কেহ শুধু মাত্র মুখস্থ করিবার ক্ষমতার সাহায্যে গণিতেব বহু বিষয় শিখিতে পারে, আবার উহা এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে যে উহার সাহায্যে শিক্ষার্থীর আরোহ ও অবরোহ যুক্তিব (Inductive and Deductive reasoning) উৎকর্ষ সাধিত হইতে পাবে।

মনোবিজ্ঞানের যে দুইটি প্রধান সূত্রের উপব ভিত্তি করিয়া **বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের** (Multipurpose Secondary School) পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হইয়াছে তাহা আমবা আলোচনা করিয়াছি। এখন এই সম্পর্কে বিরুদ্ধপক্ষের মতামত আমবা কিছু উল্লেখ কবিব।

ফ্রিমান (Freeman) প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক পণ্ডিতদেব মতে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য আছে তাহাকে খুব বড় কারয়া দেখানো ঠিক নহে। কাবণ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পার্থক্যেব চেয়ে মিল বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাহাদের বুদ্ধি, রুচি, প্রবণতা প্রভৃতি অনুযায়ী সাজাইলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাদের বুদ্ধি, প্রবণতা প্রভৃতি অনুসারে সাধারণ মানের (Norm) নিকটেই অবস্থান করে। অবশ্য দুই প্রান্তে (Extremes) যাহারা অবস্থান করিবে তাহাদের সংখ্যা সমগ্র সংখ্যার তুলনায় নগণ্য। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে মনে হয় মানুষের মধ্যে পার্থক্যের চেয়ে ঐক্যের স্থান বেশি। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে 'ব্যক্তি-পার্থক্য' লইয়া যে হৈচৈ চলিতেছে তাহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা আদৌ উচিত নহে। অতএব শিক্ষার জন্য আমাদের এমন সমস্ত বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে যাহার সাহায্যে শিক্ষার্থী সমাজের যাহা কিছু মঙ্গলময় ও বিশেষ গুণসম্পন্ন তাহা শিক্ষা করিতে

পারে। পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা (Cultural) এবং বৃত্তি-মূলক শিক্ষা (Vocational) লইয়া যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে এই স্থানে তাহা আমরা আলোচনা করিতে চাহি না। তবে আমরা এইটুকু বলিতে চাহি যে স্বদেশজননীর প্রকৃত স্বরূপ যে সকল বিষয়ের মধ্যে আমরা খুঁজিয়া পাইব এবং যে সমস্ত বিষয়ের সাহায্যে আমরা বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ জানিয়া উহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইব, তাহাকেই আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

আর একটা কথা এই স্থানে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের নীতি স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এই বিষয়টিও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যে সমস্ত বিষয় পাঠ করিলে সমাজে আর্থিক সুযোগ লাভ করা অধিকতর সহজ হয় ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত সেই সমস্ত বিষয় পাঠ করিতে আগ্রহশীল হয়। পিতামাতা ও অভি-ভাবকেরাও ঐ সমস্ত বিষয় তাহাদের সন্তানদের পড়াইবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হন। যে পর্যন্ত না সমাজে প্রত্যেকটি বিষয় আর্থিক দিক হইতে একই প্রকারের সুযোগ-বিশিষ্ট হইবে, সে পর্যন্ত শিক্ষার্থীর প্রকৃত রুচি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করা সম্ভব হইবে না। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস জাতীয় পরিকল্পনা কমিটীর কারিগরী শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছিল,—'কারিগরী শিক্ষাকে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যবহার করিতে হইলে, বিভিন্ন বিষয়ের ট্রেনিং প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আয়ের বিশেষ তারতম্য থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে নিজেদের রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করিতে সক্ষম হইবে। বর্তমানে বৃত্তি নির্বাচনে ভবিষ্যৎ আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী ছাত্রেরা বৃত্তি নির্বাচন করিতে পারে না।'

উপরের আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে শিক্ষার্থীর রুচি ও বুদ্ধির পার্থক্যের উপর ভিত্তি করিয়া যেরূপ বিভিন্ন বিষয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা চলিতেছে, তাহার সপক্ষের যুক্তিগুলি সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের মতে ছাত্রকে প্রথমে মনুষ্যত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া পরে তাহাকে বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

শিক্ষক সমস্যা

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় লইয়া আমরা সমালোচনা করিয়াছি। দেশের বর্তমান অবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে বহুমুখী পাঠ্যক্রম চালু করিবার প্রধান অসুবিধা হইবে মনে হয়। মুদালিয়র কমিশন ও রাজ্য গভর্ণমেণ্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে পড়াইবার জন্য শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করিয়াছেন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর এম, এ অথবা এম, এসসি পাশ। যাহারা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ও সুযোগ সম্পর্কে অবগত আছেন তাহারা জানেন যে প্রতি বৎসর বহু ছাত্রছাত্রী স্থানাভাবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, এম, এসসি শ্রেণীতে ভর্তি হইতে পারে না। উচ্চ শিক্ষার আরও ব্যাপক ব্যবস্থা না করিলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হইবে না।

নূতন পাঠ্যক্রমে কলা ও বিজ্ঞান ছাড়া, বাণিজ্য, কারিগরী, চারু-শিল্প ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষক কিছু কিছু পাওয়া গেলেও কারিগরী শিক্ষা প্রদানের উপযুক্ত ইন্‌জিনিয়ারিং ডিগ্রী প্রাপ্ত শিক্ষক বিদ্যালয়ের বর্তমান মাহিনায় আদৌ পাওয়া সম্ভব হইবে না। প্রত্যেকটি স্কুলের পক্ষেও সকল

বিষয়ের উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ অবস্থায় বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বহুমুখী মাধ্যমিক বিত্থালয়ে (Comprehensive School) যেরূপ ভাবে অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষাকার্য নির্বাহের চেষ্টা চলিতেছে এই দেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে নূতন শিক্ষা-সংস্কার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে। এই সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখকের মত এই যে রাজ্য সরকার মাধ্যমিক শ্রেণীতেই প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষক হিসাবে নির্বাচন করিবেন এবং এইরূপ নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বিশেষ বৃত্তি দিয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করিবেন। ইহাদের সহিত এইরূপ চুক্তি থাকিবে যে শিক্ষার শেষে ইহারা রাজ্য সরকারের নির্বাচিত কোন বিত্থালয়ে শিক্ষক হিসাবে কার্য করিবে। ইহাদের বেতন রাজ্য সরকার প্রদান করিবেন।

সংগঠন ও শাসন (Organisation and Administration)

বহুমুখী বিত্থালয়সমূহের প্রাথমিক অবস্থাতেই একটি সাংগঠনিক ত্রুটি লক্ষ্য করা যাইতেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজনানুসারে বিত্থালয় স্থাপন না করিয়া উহা খেয়াল-খুসিমত যেখানে সেখানে করা হইতেছে; এইরূপ অভিযোগ সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণ সত্য হইলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু প্রতিভাশালী ছাত্রছাত্রী শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগলাভে বঞ্চিত হইবে।

সংগঠনের অন্যতম দুর্বলতা এই যে বহুমুখী বিত্থালয়ের সহিত প্রচলিত দশ শ্রেণীযুক্ত বিত্থালয়সমূহের কোন সম্পর্ক রাখা হয় নাই। পুরাতন এবং নূতন এই দুইটি ধারা মানিয়া লইয়া বহুমুখী বিত্থালয়গুলি

স্বতন্ত্র শিক্ষা-ধারা হিসাবে স্থাপন করা হইতেছে। ইহা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ এইরূপ দুইটি ধারা চলিতে থাকিলে ভবিষ্যতে মনে হয় মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীবিভেদ ঘটিবে এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সরকারী ও বেসরকারী কাযে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষালয়ে ভর্তি হইবার ব্যাপারে বেশি সুযোগ-সুবিধা পাইবে। আবার যে সমস্ত অঞ্চলে বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নানা কারণে স্থাপন করা সম্ভব হইবে না, সেই অঞ্চলের বালক-বালিকারা অন্য অঞ্চল হইতে শিক্ষা ব্যাপারে কম সুযোগ পাইবে। আমাদের সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী জাতির প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়েকে সমান সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। দেশের সর্বত্র যদি উপযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন না করিয়া কেবল কয়েকটি বিশেষ অংশে উহা করা হইয়া থাকে এবং দেশের অধিকাংশ বালক-বালিকা উহার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয় তবে ঐরূপ ব্যবস্থা গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধী।

আরও একটি গুরুতর সমস্যার দিকে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশে যখন শিক্ষাকে সর্বস্তরে অবৈতনিক করা হইতেছে, তখন নব প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-প্রদত্ত বেতনের হার অত্যধিক ধার্য করায় দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ইহা দেশের ব্যাপক শিক্ষা-বিস্তারে বিঘ্ন ঘটাইবে।

অর্থাভাবে ও অন্যান্য কারণে ইহা দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত অঞ্চলে দশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা হইতেছে, তথায় একাধিক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা না করিয়া একটি মাত্র পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা রাখা হইতেছে। বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়াই বোধ হয় উহা সর্বত্র ব্যবস্থা করা

সম্ভব হইতেছে না। এইরূপ ব্যবস্থাও বহুমুখী পাঠ্যক্রমের মূলনীতির বিরোধী।

শাসনের দিক হইতেও বিবেচনা করিলে বহুমুখী বিদ্যালয়-সমূহকে অন্য একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী বহুমুখী পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হইবে সেই সকল বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-সংখ্যা এত বেশি হইবে যে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের পক্ষে উহার কাজকর্ম ঠিক মত পরিচালনা করা অসুবিধাজনক হইতে পারে। ছাত্র-সংখ্যা অত্যধিক হইলে বিভিন্ন ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ কম হইবে এবং অনেকে মনে করেন বিদ্যালয়ে কারখানার আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন শিক্ষার্থীর বয়ঃসন্ধিকালে উপযুক্ত শিক্ষকের সাহচর্যে কাটানো উচিত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "এই বয়সটাই মানুষের সঙ্গ প্রভাবে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল।...মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংশ্রব এই বয়সেই দরকার।"

বহুমুখী বিদ্যালয়ে বহু ছাত্রের জন্য একসঙ্গে যদি বহু বিষয় পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয় তবে শিক্ষার্থীর জীবনে 'মানুষের সংশ্রবের' অভাব ঘটিতে পারে। শিক্ষার মূলনীতির দিক হইতেও এই নীতি আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে।

উপসংহার

উপরে আমরা নব পরিকল্পিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অর্থাৎ বহুমুখী বিদ্যালয়সমূহের গুণাগুণ নির্ণয়ে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের সমালোচনা, শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির উদ্দেশ্যে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

হইতেই করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে ইহাই স্বাভাবিক। বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাহা জাতির প্রত্যেক অংশকে স্পর্শ করিতেছে—সংস্কার করিতে হইলে বিশেষ চিন্তা করিয়া এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লইয়া করিতে হইবে। শিক্ষা-বিষয়ক যে তত্ত্বের ভিত্তিতে এই নূতন বিদ্যালয়ের পত্তন করা হইতেছে তাহাকে পরীক্ষিত সত্য হিসাবে ধরিয়া লইলে, আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক আয়োজন এই সঙ্গে করিবার প্রয়োজন হইবে। যদি ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা ও রুচিভেদে পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করিতে হয় তবে উহাদের বুদ্ধি, আগ্রহ (interests), প্রবণতা বা ঝোঁক (aptitudes) প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত অভীক্ষা (tests) প্রস্তুত করিতে হইবে। যতদূর আমাদের জানা আছে,—এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন কার্য এখন পর্যন্ত কোথায়ও হয় নাই।

দেশে বিভিন্ন শিল্পের ব্যাপক প্রসার না ঘটিলে বহুমুখী বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার শেষে যদি ছাত্রছাত্রীরা জীবিকার জন্য বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিতে না পারে, তবে বর্তমানের ন্যায় তাহাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ভিড় করিবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে ইন্‌জিনিয়ারিং, মেডিকেল, উচ্চতর কলাবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির অন্তর্গত। সুতরাং উচ্চতর শিক্ষায় অনুপযুক্তদের ভিড় কমাইবার জন্য বহুমুখী বিদ্যালয়ের সাহায্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হইতেছে শিক্ষার শেষে উপযুক্ত বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ না দিলে তাহা কখনই সফল হইবে না।

ঐতিহাসিক দিক হইতেও বিষয়টিকে বিবেচনা করা উচিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়ের ব্যবস্থা থাকিলেও, ইংলণ্ডে এইরূপ বিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষার

জন্য অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 'স্পেন্স রিপোর্টে' এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, এইরূপ বিদ্যালয়ে প্রতিভাবান্ ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ কোন সুযোগ পায় না; সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের কথাই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় বহুবিধ পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের যোগ্যতা ও রুচি অনুযায়ী উহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে শিক্ষার্থীর কোন্ বয়স হইতে তাহাকে বিভিন্ন বিষয় নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া উচিত হইবে। এই সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনেরও স্পষ্ট কোন ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের মনে হয় পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের অধিকার নিশ্চয়ই সকলের থাকা উচিত, তবে অন্ততঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষার একাদশ বৎসর পরে ঐরূপ ব্যবস্থা রাখা যাইতে পারে। একমাত্র তখনই ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত নির্বাচনের ক্ষমতা জন্মিবে।

বহুমুখী বিদ্যালয়ের নানা প্রকার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও উহা যে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তনের সূত্রপাত করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। উহা আমাদের প্রচলিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়নের জন্য চেষ্টা করিতেছে, শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছে। শিক্ষাকে জাতীয় প্রয়োজনের দিক হইতে সংস্কারের চেষ্টা করিতেছে এবং জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার সহিত যে দেশের অন্যান্য পরিকল্পনার একটি সর্বাঙ্গীণ যোগ থাকা উচিত এই নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই দিক হইতে আমরা নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিকল্পনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা

'পরিকল্পনা কমিশন' গঠন, অর্থসমস্যা, উন্নতির নির্দিষ্ট লক্ষ্য, শিক্ষা পবিচালক সংস্থা, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা, বুনিয়াদী শিক্ষা, উচ্চতর বৃত্তি-শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, পল্লী অঞ্চলের জন্য উচ্চতর শিক্ষা, শিক্ষকদেব জন্য ব্যবস্থা, অন্যান্য ব্যবস্থা, সমালোচনা।

জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য উন্নততর শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। গণতান্ত্রিক দেশে জাতীয় পুনর্গঠনের কার্য সফল করিতে হইলে জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থন প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি বড়ই সুন্দর। তিনি বলিয়াছেন,—"দেশের সৌভাগ্য-সৃষ্টি-ব্যাপারে জনগণের চিত্ত সম্মিলিত হলে তবে সেটার ক্রিয়া সজীব ও স্থায়ী হয়; নিজের একনায়কত্বের প্রতি যারা লুব্ধ, নিজের চিত্ত ছাড়া অন্য সকল চিত্তকে অশিক্ষার দ্বারা আকৃষ্ট করে রাখাই তাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির একমাত্র উপায়।"

ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অর্জনের পরে নূতন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইলে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধনের জন্য এক সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে সরকারী এক প্রস্তাব মারফৎ **'পরিকল্পনা কমিশন'** গঠিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। প্রথম পরিকল্পনার কার্যকাল ছিল ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসরের জন্য। ১৯৫৬ সালের মার্চ হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য চলিতেছে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনা মারফৎ আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে পুনর্গঠনের কার্য চলিতেছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা।

উভয় পরিকল্পনায়ই বলা হইয়াছে জাতীয় উন্নতির জন্য শিক্ষা-বিস্তারের গুরুত্ব খুব বেশি। কারণ শিক্ষার সাহায্যেই জনশক্তির (Man power) গুণাগুণ বিচার করা যায়; শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার মনোবৃত্তি জাগ্রত করে, শৃঙ্খলা বোধ সৃষ্টি করে এবং দেশের প্রত্যেক স্তরে গঠনমূলক সমস্ত কার্যে জনসাধারণের উৎসাহ জন্মাইয়া স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

১৯৫১ সালে প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার উন্নতির জন্য কার্য

আরম্ভ করা হয়। সেই সময়ে শিক্ষার যে সুযোগ ছিল তাহা আদৌ আশানুরূপ ছিল না। তখন ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের শতকরা ৪০ ভাগ, ১১ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের শতকরা ১০ ভাগ এবং ১৭ হইতে ২৩ বৎসর বয়স্ক তরুণ-তরুণীদের শতকরা ০.৯ ভাগ শিক্ষার সুযোগ পাইত। ইহা ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অব্যবস্থা ও অন্যবিধ নানা কারণ বিদ্যমান ছিল। কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন ত্রুটি দূর করিয়া ইহাকে জাতীয় জীবনের উপযোগী করিবার জন্য প্রথম পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণের সপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন।

(১) শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, ও সামাজিক শিক্ষার জন্য অধিকতর সুযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) উচ্চতর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য এবং গবেষণার জন্য অধিকতর সুযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পল্লী অঞ্চলের জন্য বিশেষ ধরণের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) শিক্ষকদের বেতনের হার এবং চাকুরীর সর্ত আরও উন্নত করিতে হইবে এবং তাহাদের ট্রেনিংএরও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) কারিগরী এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) অনুন্নত রাজ্যগুলিতে শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ সাহায্য প্রদান করিতে হইবে।

অর্থ সমস্যা

কিন্তু আর্থিক সুযোগ-সুবিধার উপরই উন্নতি-মূলক পরিকল্পনার সম্পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে। শিক্ষার উন্নতির জন্য আর্থিক ব্যবস্থাকল্পে

কেন্দ্রীয় সরকার একটি কমিটী নিয়োগ করিলেন। উক্ত কমিটীর মতে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের শতকরা ১০০ জনের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য, উহার শতকরা ২০ জনের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার জন্য এবং মাধ্যমিক স্তরের শতকরা ১০ জনের উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য ৪০০ কোটী টাকা প্রয়োজন হইবে। ইহা ছাড়া বুনিয়াদী ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিংএর জন্য প্রয়োজনে হইবে ২০০ কোটী টাকা। প্রাথমিকও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজন হইবে আরও ২৭২ কোটী টাকা।

১৯৪৯-৫০ সালে শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটী টাকা। প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হইল ১৫১·৬৬ কোটী টাকা অর্থাৎ বৎসরে ব্যয়ের হার হইল ৩০·৩৩ কোটী টাকা। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ঐ টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৯ কোটী টাকা। প্রথম পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ অর্থের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করিবেন ৩৫·০২ কোটী টাকা এবং রাজ্য সরকার-গুলির ভাগে পড়িল ১১৬·৬৪ কোটী টাকা।

শিক্ষা বিষয়ক অর্থসংস্থান কমিটীর মতে ঐ অর্থের পরিমাণ আদৌ পর্যাপ্ত নহে। এই জন্য আরও বেশি অর্থ সংগ্রহের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে শিক্ষার প্রসারের জন্য জনসাধারণ যথেষ্ট অর্থ, পরিশ্রম ও জমি দান করিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিটীর মতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে এই ব্যাপারে জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে দেখা গেল এই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। শিক্ষার উন্নতিকে আরও ত্বরান্বিত করিবার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ হইল ৩০৭

কোটী টাকা; উহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করিবেন ৯৫ কোটী টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলি ব্যয় করিবেন ২১২ কোটী টাকা। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে উভয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিক্ষাখাতে উন্নতি-মূলক ব্যবস্থার একটি আভাস পাওয়া যাইবে।

বিষয়	ম পরিকল্পনা কাটী টাকা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা কোটী টাকা
১। প্রাথমিক শিক্ষা	৯৩	৮৯
২। মাধ্যমিক শিক্ষা	২২	৫১
৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা	১৫	৫৭
৪। কারিগরী ও বৃত্তি-মূলক শিক্ষা	২৩	৪৮
৫। সামাজিক শিক্ষা	৫	৫
৬। পরিচালনা ও অন্যান্য	১১	৫৭
	মোট ১৬৯	মোট ৩০৭

পরিকল্পনা কমিশনের মতে ২য় পরিকল্পনার এই অর্থের সহিত সমাজ উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ১২ কোটী টাকা এবং সামাজিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ১০ কোটী টাকা শিক্ষা খাতের ব্যয় হিসাবেই ধরা উচিত।

উন্নতির নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Target)

প্রথম পরিকল্পনায় কমিশন বিভিন্ন শিক্ষার উন্নতির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ লক্ষ্য আরও উন্নততর করা হইল। আমরা উহার সারাংশ এইখানে প্রদান করিতেছি।

(১) প্রথম পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে ৬-১১ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের শতকরা ৬০ ভাগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বালিকাদের জন্য বিশেষ করিয়া ঐ হার হইবে প্রথম পরিকল্পনার সময়ের ২৩·৬% হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০% পর্যন্ত। প্রথম পরিকল্পনার শেষে দেখা গেল যে নানাবিধ অসুবিধার জন্য ঐ বয়সের

বালকবালিকাদের জন্য শিক্ষার উন্নতির হার হইল ৫১% (১৯৫০-৫১ সালে উহা ছিল ৪২%) এবং ২য় পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে আশা করা হইল যে ঐ হার হইবে ৬২.৭%।

(২) ১১ হইতে ১৪ বৎসরের বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রে উহা এইরূপ স্থির হইল,—

১৯৫০-৫১ সালে ১৩.৯%, ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৯.২% এবং ২য় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে উহা হইবে ২২.৫%।

(৩) ১৪-১৭ এই বয়সের বালক-বালিকাদের সংখ্যা ছিল ১৯৫০-৫১ সালে ৬.৪%, ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা হইল ৯.৪% এবং ২য় পরিকল্পনার শেষে উহা হইবে ১১.৭%

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে আমাদেব সংবিধান অনুযায়ী সংবিধান চালু হইবাব ১০ বৎসবের মধ্যে ৬-১৪ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাব ব্যবস্থা কবিতে হইবে। ১ম ও ২য় প্লান (plan) পরীক্ষা করিলে দেখা যায় প্রথম প্লানের পূর্বে ঐ বয়সের বালক-বালিকাদের শিক্ষাব সুযোগ ছিল ৩২%, প্রথম প্লানের শেষে উহা হয় ৪০% এবং দ্বিতীয় প্লানেব শেষে আশা করা হইয়াছে যে উহা হইবে ৪৯%। কমিশনের মতে ঐ বয়সের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন হইবে। ঐ অর্থ জনসাধারণের নিকট হইতে দান হিসাবে এবং বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষ প্রবর্তন করিয়া সংগ্রহ করিবার চেষ্টা কবা যাইতে পারে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা এবং কারিগরী ও বৃত্তিশিক্ষার জন্য আরও ব্যাপক ব্যবস্থা কবা হইবে স্থির হইল।

শিক্ষা পরিচালক সংস্থা (Agencies)

কমিশনের মতে শিক্ষার পরিচালনা এবং উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত 'সংস্থা'-গুলির উপর ভার অর্পণ করিতে হইবে। যথা,—

(১) কেন্দ্রীয় সরকার, (২) রাজ্য সরকারসমূহ,

(৩) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (Local bodies) .

(৪) বেসরকারী সংস্থাসমূহ (Private Agencies)

অবশ্য সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা পরিচালনায় প্রধান দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির।

কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণভাবে সর্বস্তরের শিক্ষার উন্নতির জন্য সাহায্য করিবেন। তবে তাহাদের প্রধান কার্য হইবে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার প্রসার ও মানের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনয়ন করা (Co-ordination)। এ পর্যন্ত নানাবিধ কারণে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য এই ব্যাপারে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত আর্থিক সঙ্গতিও বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। তবে বর্তমানের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী এই কার্য নির্বাহ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। তবে যে সমস্ত রাজ্য শিক্ষাবিষয়ে অনুন্নত তাহাদিগকে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার অধিক সাহায্য করিবেন। অন্য রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য প্রদানের ধরণ হইবে আংশিক সাহায্য প্রদানেব নীতি অনুযায়ী। অর্থাৎ যে সমস্ত রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা, ট্রেনিং, উন্নত ধরণের পুস্তক প্রণয়ন এবং বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সহযোগিতায় রাজি হইবেন তাহাদিগকে আনুপাতিক হারে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করিবেন। দেশের সমস্ত অংশের শিক্ষা-বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে উপদেশ প্রদানের জন্য এবং সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে বুনিয়াদী শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে 'বিশেষজ্ঞ কমিটী' থাকিবে।

কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্যই **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ**

দায়ী থাকিবেন। শিক্ষা পরিচালনায় বিকেন্দ্রীকরণ নীতি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব গ্রহণ করিতে হইবে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যও শিক্ষার প্রসার ও পরিচালনার জন্য গ্রহণ করিতে হইবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্যে অত্যন্ত কম ব্যয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা করা যাইতে পারে এবং তাহারা সরকারী লাল ফিতার অধীন না হওয়ায়, কার্য পরিচালনায় তাহাদের দক্ষতাও বেশি হইয়া থাকে। পাঁচসালা পরিকল্পনায় ইহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতে হইবে।

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা

প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে প্রথম পরিকল্পনায় কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে কমিশনের মত এই যে এই স্তরের শিক্ষা হইবে ছয় বৎসরের চেয়ে কম বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য এবং বর্তমানে অর্থাভাবের জন্য এই স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের পক্ষে লওয়া সম্ভব নয়। এই স্তরের শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা বেসরকারী সংস্থাসমূহের উপর থাকিবে। দ্বিতীয় প্লানে এই সম্পর্কে কোনরূপ উল্লেখ নাই।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য পরিকল্পনা কমিশন বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। তবে প্রথম পরিকল্পনায় এই স্তরের শিক্ষার উন্নতির জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় তাহার পরিমাণ কমানো হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এই যে এই শিক্ষার সুযোগ আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং পুরাতন বিদ্যালয়গুলিকে ধীরে ধীরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৬-১১ বৎসরের বালক-বালিকাদের শতকরা ৬৩ ভাগ (ইহার মধ্যে বালকের সংখ্যা ৮৬% এবং বালিকার সংখ্যা ৪০%) এবং ১১-১৪

বৎসরের বালক-বালিকাদের শতকরা ২৩ ভাগ (বালক ৩৬%, বালিকা ১০%) এই শিক্ষা পাইবে। আমাদের সংবিধানের নীতি নির্দেশক ধারা অনুযায়ী এই বয়সের বালক-বালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও দেখা যাইতেছে আমরা লক্ষ্য হইতে বহু দূরে আছি। কমিশনের মতে আগামী ১০ অথবা ১৫ বৎসরে আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ সমস্যার দিকে কমিশন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমত **শিক্ষার অপচয়** (wastage)। কমিশন লক্ষ্য করিয়াছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম চারিটি শ্রেণীতে শিক্ষার অপচয়ের পরিমাণ শতকরা ৫০, অর্থাৎ ১ম শ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত এই চারি বৎসরের মধ্যে শতকরা ৫০ জন শিক্ষা সম্পূর্ণ না করিয়াই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। আবার বালিকাদের পক্ষে এইরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষার হার সর্বাপেক্ষা বেশি। প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় সমস্যা হইল **শিক্ষার অনুন্নতি** (stagnation) অর্থাৎ একই শ্রেণীতে অধিক সময় অতিবাহিত করা।

শিক্ষার অপচয় দূর কবিবার জন্য কমিশনের মতে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এই বাধ্যতামূলক আইন পাশ করিবার পূর্বে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন পল্লীগ্রামে ফসল উঠাইবার সময় বিদ্যালয় ছুটি রাখিবার ব্যবস্থা করা যায়। তাহা হইলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনে সকলের সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রথম পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক আইন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হইয়াছিল। শিক্ষার অনুন্নতি রোধ করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন কমিশন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান সমস্যা হইল বালিকাদের শিক্ষা সমস্যা। এই সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই। স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন থাকিলে "সহশিক্ষা" প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অথবা যেখানে সম্ভব সেখানে 'শিফ্‌ট (shift) ব্যবস্থা' চালু করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে উপযুক্ত-সংখ্যক মহিলা শিক্ষকেরও অভাব আছে। ১৯৫৩-৫৪ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের মধ্যে মহিলা শিক্ষকদের সংখ্যা মাত্র ১৭%। কমিশনের মতে **তৃতীয় পরিকল্পনায়** স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে মহিলা শিক্ষকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১-১৪ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকারা যাহারা নানা কায করিয়া পারিবারিক খরচের কিছু অংশ প্রদান করে, তাহাদের জন্য আংশিক সময়ের বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বহু গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হইবে। উহা তৈয়ারীর ধরণ অত্যন্ত সরল করিতে হইবে। গ্রামে যে সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করা যায়, তাহার সাহায্যে অল্প ব্যয়ে উহা নির্মাণ করিতে হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য আরও অর্থ সংগ্রহের ভার কমিশন স্থানীয় কমিটীর (Local bodies) হাতে দিতে চাহিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েতদের **কর স্থাপনের** ক্ষমতা দিতে হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা

কমিশন বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার কথা পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে বুনিয়াদী পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিয়াছি। ১৯৫০-৫১ সালের হিসাব

হইতে দেখা যায় প্রাথমিক স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা ১ ভাগ বুনিয়াদী বিত্থালয়ে শিক্ষা লাভ করে। প্রথম পরিকল্পনার পরে ঐ সংখ্যা হয় শতকরা ৪ ভাগ এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে ১১% হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে বুনিয়াদী বিত্থালয় স্থাপন এবং পরিচালনার খরচ পুরাতন শ্রেণীর বিত্থালয় অপেক্ষা অনেক বেশি। এইজন্য কমিশনের মতে বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থকরী শিল্প-শিক্ষার সম্ভাবনাকে বিশেষ করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে। বুনিয়াদী বিত্থালয়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদি স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী হওয়া উচিত। এই জন্য বুনিয়াদী বিত্থালয়ের কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতিকে এমনভাবে কাজে লাগাইতে হইবে যে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি, কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও জাতীয় অন্যান্য উন্নতি পরিকল্পনার সহিত একযোগে ঐরূপ বিত্থালয়ের কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়। গ্রাম্য বিত্থালয়গুলি এরূপভাবে পরিচালনা করিতে হইবে যাহাতে উহারা গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

কমিশনের মতে বর্তমানের পাঁচ শ্রেণীযুক্ত বিত্থালয়গুলিকে আট শ্রেণীযুক্ত বুনিয়াদী বিত্থালয়ে পরিণত করিতে হইবে। ইহা বর্তমানে সম্ভব না হইলে কেন্দ্র স্থানে একটি আট শ্রেণীযুক্ত বিত্থালয় স্থাপন করিয়া উহার চারিদিকে পাঁচ শ্রেণীযুক্ত পোষক বিত্থালয় (feeder Schools) স্থাপন করা যাইতে পারে।

বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য জনসাধারণের সমর্থন বিশেষভাবে পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইল যে স্থানীয় ব্যক্তিদের উৎসাহ অনুযায়ী বুনিয়াদী বিত্থালয় স্থাপন করা উচিত। যে সমস্ত গ্রাম বা স্থানীয় কমিটী বুনিয়াদী বিত্থালয় স্থাপনের জন্য ৫ একর পরিমাণ জমি প্রদান করিতে সম্মত হইবে সেই সকল অঞ্চলে বুনিয়াদী বিত্থালয় স্থাপনে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পর্কে প্রথম প্লানে এইরূপ মন্তব্য করা হইল যে ইহা তরুণ-তরুণীদের বয়ঃসন্ধিকালেব শিক্ষা। সুতরাং এই স্তরের শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা, যোগ্যতা এবং রুচির দিক হইতেই বিবেচনা করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের (Socio-economic reconstruction) সহিত এই শিক্ষাকে যুক্ত করিতে হইবে। বিভিন্ন বৃত্তির প্রয়োজন অনুসারে এই শিক্ষাকে পরিবর্তন করিতে হইবে। অর্থাৎ এই স্তরের শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতিতে বিভিন্ন বৃত্তি অনুযায়ী পক্ষপাত (bias) থাকিবে।

কমিশন বহুমুখী বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই জন্য ৫১ কোটী টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন এবং প্রথম পরিকল্পনায় উহার পরিমাণ ছিল ২২ কোটী টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রথম পরিকল্পনার চেয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন দুই শ্রেণীর কার্য-ক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমত অনেক নূতন বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত পুরাতন উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করিতে হইবে। প্রথম প্লানের সময় ২৫০টি বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় প্লানে ঐ সংখ্যা বাড়াইয়া ১১৮৭টি করা হইবে। উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চতর বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ঐ সংখ্যা ১০,৬০০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১২,০০০ করিতে হইবে। আবার ঐ সময়ে ১১৫০টি উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হইবে। তাহা হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হইবে

২,৮০০টি। গ্রাম্য অঞ্চলের ২০০টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মাধ্যমিক শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১ লক্ষ হইবে।

বিভিন্ন শিল্পে অর্দ্ধশিক্ষিত শ্রমিক হিসাবে এবং স্বাধীন ব্যবসার জন্য কিছু তরুণ-তরুণীকে বিশেষ কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে। এই জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯০টি নিম্নতর কারিগরী বিদ্যালয় (Junior Technical Schools) স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ১৪-১৭ বৎসরের তরুণ-তরুণীরা শিক্ষালাভ করিতে পারিবে এবং ইহার শিক্ষাকাল হইবে তিন বৎসর।

শিক্ষণ-শিক্ষার জন্যও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল ৬০%। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ৬৮% হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থাও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক প্রয়োজন। ঐ উদ্দেশ্যে প্রায় ১৫০০ শিক্ষকদের ট্রেনিং প্রদানের জন্যও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য রাজ্য সরকারগুলি ব্যয় করিবে ৪৬ কোটী টাকা। ইহা উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করিবার জন্য, বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-পরীক্ষাগারের উন্নতির জন্য, গ্রন্থাগার পুনর্গঠনের জন্য, শিক্ষকদের ট্রেনিং এর জন্য, শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতির জন্য, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা হইবে।

মাধ্যমিক স্তরে বালিকাদের শিক্ষার জন্য, হিন্দী ভাষা ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষা দানের জন্য দ্বিতীয় প্লানে ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

প্রচলিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সংযোগের জন্যও কমিশন কিছু সুপারিশ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা কমিশন প্রথম পরিকল্পনায় ১৫ কোটী টাকা বরাদ্দ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা বৃদ্ধি করিয়া ৫৭ কোটী টাকা করা হয়। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির উপর বেশি জোর প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান কমিশন (University Grants Commission) গঠিত হইবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য তাহাবা কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহার মধ্যে প্রধান ব্যবস্থাগুলি হইল তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন, টিউটোরিয়াল ক্লাশ ও সেমিনারের বন্দোবস্ত, ছাত্রাবাসেব ব্যবস্থা, ল্যাবোরেটরী, লাইব্রেরী প্রভৃতির উন্নতি সাধন, যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড (Stipends) প্রদানের ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধি প্রভৃতি। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও গৃহীত হইল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে সাতটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে এইরূপ স্থির হইল।

শিক্ষাক্ষেত্রে অন্য কয়েকটি ব্যবস্তাও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে বলিয়া মনে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে বহুমুখী পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন এবং সরকারী চাকুরীতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অপ্রয়োজনীয়তা এই দুইটি বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত বিশেষভাবে যুক্ত। প্রথম ব্যবস্থার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট কলেজগুলিতে ছাত্রদের ভিড় কম হইবে। কমিশনের মতে এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে এক বিশেষ

উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির সহিত যুক্ত করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতির জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে উহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দিবেন ৩৪.৪ কোটী টাকা এবং রাজ্য সরকারগুলি ব্যয় করিবেন ২২.৫ কোটী টাকা। তবে ইহার অধিকাংশই ব্যয় করা হইবে প্রয়োগিক (technical) ও বৈজ্ঞানিক (scientific) শিক্ষার প্রসারের জন্য।

উচ্চতর বৃত্তি শিক্ষা (Professional Education) ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষা (Technical Education)

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে বিশেষ জোর প্রদান করা হইয়াছে। কারণ দেশ যতই শিল্পসমৃদ্ধ হইতেছে, শিল্প ও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনও ততই বাড়িতেছে। প্রথম পরিকল্পনায় এই সম্পর্কে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহা বাড়াইয়া করা হইয়াছে ৪৮ কোটী টাকা। প্রথম পরিকল্পনায় এই পর্যায়ের শিক্ষার বিশেষ প্রসার ও উন্নতি হইয়াছে।

সামাজিক শিক্ষা (Social Education)

সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন মনে করেন বর্তমানে যে ভাবে বয়স্কদের লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সঙ্কীর্ণ লক্ষ্যবিশিষ্ট। কারণ এই শিক্ষার উদ্দেশ্য বয়স্কদের অক্ষর পরিচয় করাইয়া সামান্য লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা প্রদান করা। বর্তমানে নূতন সামাজিক পরিস্থিতিতে এই নীতি গ্রহণযোগ্য নহে। বর্তমানে বয়স্ক শিক্ষার লক্ষ্য আরও ব্যাপক।

ইহার মধ্যে লিখিতে-পড়িতে শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও অন্যান্য বিষয় যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, গার্হস্থ্যজীবনের সমস্যা, পারিবারিক আর্থিক সমস্যা এবং নাগরিক শিক্ষা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

১৯৫১ সালের লোকগণনার হিসাব হইতে দেখা যায় যে দেশের শিক্ষিতেব সংখ্যা মাত্র ১৬·৬% এবং এই সংখ্যা হইতে যদি ১০ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বাদ দেওয়া যায় তবে এই সংখ্যা হইবে শতকরা ২০ জন। স্ত্রী পুরুষ ভেদে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে শিক্ষিত পুরুষদের সংখ্যা শতকরা ২৪·৯ জন এবং স্ত্রীলোকদের সংখ্যা শতকরা ৭·৯ জন মাত্র। আবার সহর এলাকায় শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৪·৬ জন এবং পল্লী অঞ্চলে ঐ হার ১২·১%। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে শিক্ষিতের হার নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু আবার দেশে অশিক্ষিতের হার এইরূপ বেশি হইলেও দেশের উন্নতি নানা কারণে ব্যাহত হইতে পারে।

দেশের ব্যাপক অশিক্ষা দূর করিবার জন্য কমিশনের সুপারিশ এই যে বালক-বালিকাদের জন্য অধিকতর শিক্ষার (Continuation Classes) এবং জনসাধারণের জন্য সামাজিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কর্মীদের শিক্ষিত করিতে হইবে। কমিশন সামাজিক শিক্ষাখাতে ৫ কোটী এবং জাতীয় ও সমাজ উন্নয়ন কার্যের জন্য ১০ কোটী মোট ১৫ কোটী টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

পল্লী অঞ্চলের জন্য উচ্চতর শিক্ষা (Higher Rural Education)

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন পল্লী অঞ্চলের জন্য কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষার উপযোগী ইন্‌স্‌টিটুইট স্থাপনের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। নবগঠিত 'পল্লী অঞ্চলের জন্য উচ্চতর শিক্ষা কমিটী' (The Higher Rural Education Committees) নূতন ভাবে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া উক্ত

সুপারিশ সমর্থন করেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ইহাদিগকে পল্লী অঞ্চলের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য গঠনমূলক কার্যের কেন্দ্র হিসাবে গঠন করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১০টি এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ২ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হয়।

শিক্ষকদের জন্য ব্যবস্থা

পরিকল্পনা-কমিশন স্বীকার করিয়াছেন শিক্ষকই সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার কেন্দ্র। উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষকতা কার্যে আকর্ষণের জন্য শিক্ষকতা বৃত্তি হিসাবে লোভনীয় হওয়া প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে শিক্ষকদের সংখ্যা ছিল ৭·৩ লক্ষ ; প্রথম পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১০·২৪ লক্ষ এবং আশা করা যায় ১৯৬০-৬১ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা দাঁড়াইবে ১৩·৫৬ লক্ষ।

প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষকের হার ছিল যথাক্রমে ৫৯% ও ৫৪%। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ঐ হার বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে দাঁড়ায় ৬৪% ও ৫৬%। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৭ কোটী টাকা শিক্ষকদের ট্রেনিংএর জন্য ধরা হইয়াছে ; তদুদ্দেশ্যে ২৩১টি ট্রেনিং স্কুল এবং ৩০টি ট্রেনিং কলেজ খোলা হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয় এবং এই উদ্দেশ্যে বলা হয় যে ইহা সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকার-গুলির দায়িত্বের অন্তর্ভূত। শিক্ষকদের বেতনের হার বিভিন্ন রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী স্থির করা উচিত। সুতরাং রাজ্যভেদে উহা বিভিন্ন হইতে বাধ্য। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধির জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে সাময়িকভাবে তাহার অর্ধেক বহন করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকি অর্ধেক রাজ্য সরকারগুলি বহন করিবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দায়িত্ব বহন করিবার

উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারগুলির উচিত বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের খরচ যতদূর সম্ভব কম করা। অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য বিশেষ শিক্ষাকরও (Special educational cess) বসানো যাইতে পারে।

অন্যান্য ব্যবস্থা

(১) বৈদেশিক ছাত্রদের ভারতে পড়িবার জন্য এবং দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ১২ কোটী টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

(২) হিন্দী ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

(৩) অল্পমূল্যে পুস্তক প্রকাশের জন্য 'জাতীয় পুস্তক তহবিল' (National Book Trust) স্থাপন করা হইবে।

(৪) নৃত্য-নাটক-সঙ্গীত একাদমী স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে।

(৫) মিউজিয়ামের উন্নতি, জাতীয় শিল্প গ্যালারী, শিশুভবন স্থাপন, কলিকাতার জাতীয় লাইব্রেরীর উন্নতি সাধন এবং দিল্লীতে নূতন লাইব্রেরী স্থাপন করা হইবে।

সমালোচনা

প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের কার্যক্রম শেষ হইয়াছে। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার শেষে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার যে উন্নতি আশা করা হইয়াছিল তাহা নানা কারণে সফল হয় নাই। প্রথমত সরকারী শাসনযন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ থাকায় বিভিন্ন খাতে বহু অর্থ অপচয় হইয়াছে। দ্বিতীয়ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই। প্রত্যেক স্তরের শিক্ষাকেই আলাদা আলাদা ভাবে দেখা হইয়াছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কোন নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কোনরূপ উন্নতির ব্যবস্থা না করিয়াই, মাধ্যমিক শিক্ষা-

সংস্কারের চেষ্টা চলিতেছে। আবার এই সংস্কারের পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কোনরূপ নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য বড় বড় বাড়ী তৈয়ারী করা হইতেছে এবং ঐ জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইতেছে। কিন্তু ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল তাহা করা হইতেছে না। তৃতীয়ত, পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমকে সফল করিতে হইলে জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া শিক্ষকদের আন্তরিক সমর্থন প্রয়োজন। সরকারী কার্যক্রম ও পদ্ধতির ত্রুটির জন্য এই সমর্থন পাওয়া সম্ভব হয় নাই।

তবুও মনে রাখিতে হইবে অভিজ্ঞতা আমাদের পথপ্রদর্শক। প্রথম পরিকল্পনা যে যে কারণে আশানুরূপ ভাবে সফল হয় নাই, দ্বিতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আমাদিগকে সফলতার দিকে চালিত করিবে আমরা এইরূপ আশা করিতে পারি।

ভ্রম সংশোধন

ছাপা হইয়াছে	পড়িতে হইবে	পৃষ্ঠা ও পংক্তি
পরববর্তী	পরবর্তী	৬ ২০
ব্যস্থায়	ব্যবস্থায়	১১, ৮
অভিন্ন	অভিজ্ঞ	১০৩, ১৯
কারণে ছিল না	কারণে সম্ভব ছিল না	১০৪, ২১
ইলংণ্ডের	ইংলণ্ডের	১৩৮, ১৭
পরিচলনায়	পরিচালনায়	১৪০, ১৭
রন্ধন বিদ্যা	রন্ধন বিদ্যা	১৫৯, ৮